শিবানন্দ-বাণী

দ্বিতীয় ভাগ

স্বামী অপূর্বানন্দ
সংকলিত

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

বেলুড় মঠ
বিভিন্ন সময়ের প্রসঙ্গ

একদিন দ্বিপ্রহরে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার নিজের ঘরে বিশ্রামের জন্য শুইয়া আছেন। জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য কাছে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন; ঘরে অন্য কোন লোক নাই। হঠাৎ মহাপুরুষজী বলিলেন—দেখ, সংসারী লোকেরা মনে করে, ব্রহ্মজ্ঞান একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করেন, মানুষের পক্ষে সংসার নিয়ে ভুলে থাকা একটা অসম্ভব ব্যাপার। শান্ত গম্ভীর করুণাসিক্ত এই কথাগুলি এতই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, শিষ্যের স্মৃতিপটে উহা চিরদিনের মতো অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

অন্য একদিন মঠের জনৈক সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন—দেখ, ল—, শাস্ত্র কি পড়ছ? আমাদের জীবন পড়তে পারো? আমাদের জীবনই উপনিষদ্। এর মধ্যেই শাস্ত্রের মর্ম দেখতে পাবে।

সেই ঘরে উপস্থিত সাধুবৃন্দ কথাগুলি অতি সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতই মহাপুরুষগণের জীবনবেদ পাঠ করিতে পারিলে শাস্ত্রমর্ম আপনিই আয়ত্ত হইয়া যায়।

এক সময়ে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত মঠের নিয়মাবলী লইয়া পূর্বোক্ত শিষ্য স্বামী সারদানন্দজীর নিকট যান। ঐ পুস্তিকায় লিখিত কথাগুলির মধ্যে স্বামীজীর নিজস্ব মত কতটা আছে এবং কোন বিষয়ে স্বামী সারদানন্দজীর স্বতন্ত্র মত আছে কিনা, ইহাই ছিল জানিবার বিষয়। এক একটি করিয়া নিয়মগুলি পড়া হইতে লাগিল এবং স্বামী সারদানন্দজী প্রত্যেক নিয়মের ভিত্তি যে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা ও বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিজের ঐ বিষয়ে ব্যক্তিগত কোন স্বতন্ত্র মত নাই, এবং শিষ্যকে তাঁহার প্রশ্ন লইয়া মহাপুরুষ মহারাজের কাছে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। শিষ্য মহাপুরুষ মহারাজের নিকট গিয়া প্রশ্নটি করিবা মাত্র তিনি এক কথায় যেন স্বামী সারদানন্দজীর মীমাংসার অনুবৃত্তি করিয়াই বলিলেন—দেখ, ঠাকুর হচ্ছেন বেদ, আর স্বামীজী তার ভাষ্য; এঁদের বাইরে আমাদের কোন কথাই নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে প্রতিষ্ঠানটির কাজে শিষ্য নিযুক্ত ছিলেন, তথা হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা তাঁহার কয়েকবার হইয়াছিল। প্রতিবারই নানাভাবে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়া মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। শেষবার যখন তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি সকরুণ স্বরে শিষ্যের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া

বলিয়াছিলেন—দেখ, প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা বহু লোকের কল্যাণ হবে। আর ওখানে থাকার জন্য যদি তোমার ক্ষতি হয়, তা আর কিছু নয়, হয়তো তোমার অভীষ্ট-লাভের কিছু দেরি হতে পারে। দেরি অবশ্য হবে না। কিন্তু যদিই-বা হয়, তুমি কি এতগুলি লোকের কল্যাণের জন্য এইটুকু sacrifice (ত্যাগ স্বীকার) করতে পারবে না?

* * *

১৯১৬ খ্রীঃ মহাপুরুষ মহারাজ যখন ৺কাশীতে ছিলেন, সেই সময় একদিন কথাপ্রসঙ্গে আশ্রমস্থ সাধুদের বলেন—সাধন-ভজন নিয়ে কারো বড়াই করতে নেই। যদি তোমার নির্বিকল্প সমাধিই লাভ হয়, তাতেই-বা কি? তুমি যা ছিলে আবার তাই হবে। এতে আর অহংকার করবার কি আছে? কি অদ্ভুত নিরভিমান ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় এই সরল কথা কয়টির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে!

বেলুড় মঠে অবস্থানকালে মহাপুরুষজী একদিন বলেন—আমরা তখন স্বামীজীর সঙ্গে আলমোড়ায় আছি। একজন ভক্ত আমরা thought-reading (মনের কথা বলিয়া দেওয়া) জানি কিনা জিজ্ঞাসা করলে, স্বামীজী আমাকে ডেকে কি করে তা করতে হয় শিখিয়ে দিলেন। বললেন, 'কারো মনের কথা জানতে হলে প্রথমে নিজের মনটাকে একেবারে খালি করে ফেলবে। তারপর যে চিন্তাটা তোমার মনে প্রথম উঠবে, সেইটাই জানবে প্রশ্নকারীর মনের চিন্তা।' স্বামীজীর কথা শুনে আমি সেই ভক্তকে বললাম, 'আচ্ছা, তোমার মনে কি আছে বলব।' এই বলে ধ্যানের দ্বারা মনটাকে একেবারে খালি করে ফেললুম। তারপরই দেখি একটা চিন্তা উঠেছে। তখন ভক্তটিকে বললুম, 'তুমি এই মনে করেছিলে?' সে স্বীকার করলে।

* * *

১৯২৬ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বহু সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের সহিত ৺বৈদ্যনাথধামে গমন করেন এবং তথায় প্রায় একমাস কাল অবস্থান করেন। সেই সময় বিদ্যাপীঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার দিব্যসঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। খুবই আনন্দে দিনগুলি কাটিতেছিল। একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় মহাপুরুষ মহারাজের প্রবল সর্দি ও হাঁপানির আক্রমণ হয়। ঐ সময় জনৈক সন্ন্যাসী একদিন সকালে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিল যে, পীড়ার প্রাবল্যে তাঁহার কথা বলিতে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। তথাপি তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছ?

সন্ন্যাসী—আমরা তো ভাল আছি। আপনি কাল রাত্রে কেমন ছিলেন?

মহাপুরুষজী—রাত্রে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। সর্দিতে ক্রমে ক্রমে নাক বুজে গিয়ে দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো। হাঁপও বেড়ে উঠল। বসে, কাত হয়ে, শুয়ে, কোন রকমে আরাম পেলুম না। চারদিকে বালিশ দিয়ে, এখন যেমন দেখছ এমনি করে, মাথা ঠেস

দিয়ে রইলুম—তাতেও কষ্টের লাঘব হলো না। ক্রমে মনে হতে লাগল যেন সব ইন্দ্রিয়গুলি বন্ধ হয়ে আসছে, আর প্রাণটা যেন এখনি বেরিয়ে যাবে। তখন অনন্যোপায় হয়ে ধ্যান করতে লাগলুম। বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা—অল্পক্ষণ পরেই মনটা (হৃদয়ের দিকে দেখাইয়া) একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্রণা নেই, কোন কষ্ট নেই—স্থির প্রশান্ত। বাইরের ঝড়-ঝাপটা সেখানে স্পর্শ করতে পারছে না। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকবার পর আবার বাইরের দিকে মন এলো। তখন দেখি কষ্টটা আগের চেয়ে একটু কম।

সন্ন্যাসী—ওটা কি?

মহাপুরুষজী—ওই তো আত্মা।

*　　　*　　　*

১৯২৭ খ্রীঃ শেষভাগে মহাপুরুষ মহারাজ যখন শেষবার কাশীতে যান, তখন কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিলেন—এই কাশীক্ষেত্রের সমস্তটাই শিবের শরীর। আমরা শিবের মধ্যে বাস করছি।

আর একদিন বলিলেন—এ হচ্ছে মহাশ্মশান। এখানে গৃহস্থদের সংসার করা ঠিক নয়। যারা ভগবানকে ডাকবে, তাঁর নাম করবে, তাদেরই এখানে থাকা উচিত।

কাশী হইতে মঠে ফিরিবার পর মহাপুরুষজীর বায়ুর প্রকোপ হয়। ঔষধাদি-ব্যবহারেও কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া একদিবস পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তাররা আপনার বায়ুরোগ হয়েছে বলে ঠিক করেছেন। আমার তো তা মনে হয় না। এটা কোন যোগজ ব্যাপার। কাশীতে আপনার কোন রকম দর্শন হয়েছিল কি? কেন-না, কাশী থেকে আসার পরই এর সূত্রপাত দেখছি।

মহাপুরুষজী—হাঁ, কাশীতে এক শ্বেতকায় যোগিমূর্তি দেখি। তারপর থেকেই এইরকম হয়েছে।

বেলুড় মঠ

২৪ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩৬—৯ অগস্ট, ১৯২৯

আজ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মাদ্রাজে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি সকালে আসিয়া প্রণাম করিতেই মহাপুরুষজী সস্নেহে বলিলেন—আজ তো যতীশ্বর চলল। এ-যাত্রায় অনেক দিন মঠে ছিলে ঠাকুরের স্থানে। আমি আশীর্বাদ করছি, যেখানেই যাবে ঠাকুর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

অন্য সময় উক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে মঠ ও মিশন-সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা হইতে

হইতে ক্রমে ঠাকুরের সঙ্ঘশক্তির সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন—সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যের জয় চিরকাল হয়ে আসছে, হবেও বাবা। এ-সব ঐশী শক্তির খেলা। ঠাকুর স্থূল শরীর ত্যাগ করে এখন এই সঙ্ঘের ভেতর রয়েছেন। এখন ঠাকুর আছেন সঙ্ঘরূপে—এ হলো স্বামীজীর কথা। এই যে তোমরা সব ভক্তেরা দূর দূর শাখাকেন্দ্র হতে এসে একত্র হয়েছ, এর ফল অতি শুভ হবে। ঠাকুর যে এখনো সঙ্ঘকে রক্ষা করছেন এবং ভবিষ্যতেও রক্ষা করবেন, তা কখনো বা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তিনি জানিয়ে দেন। স্বামীজী নিজে ঠাকুরের নির্দেশ মতো এই সঙ্ঘ সংগঠন করেছেন; আর তাঁর উদার ধর্মভাব সমগ্র জগতে প্রচারের বিরাট দায়িত্ব এ-সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। কেউ এই সঙ্ঘের অনিষ্ট করতে পারবে না, নিশ্চিত জেনো। যদি কেউ কখন অন্যরকম মতলব নিয়েও আসে, তা হলে ঠাকুর তাদের মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন, সকলকে তিনি বুঝিয়ে দেবেন—এমনকি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলেও। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ তো ভুল করবেই, কিন্তু তিনি সকলকেই কৃপা করেন। পাপী, তাপী কেউ তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না। স্বামীজী বলেছেন না—'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ' ইত্যাদি? তিনি সকলকেই ক্ষমা করেন। আচণ্ডালে কৃপা করার জন্যই তো তিনি এই রামকৃষ্ণরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তোমরা তো পড়েছ যীশুখ্রীস্টের কথা। যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছিল, তাদের জন্যও তিনি ভগবানের নিকট কাতরপ্রাণে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিলেন—'প্রভু, এদের ক্ষমা কর। এরা কি অন্যায় করেছে তা জানে না।' সেই পরব্রহ্মই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। আমরা তো স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর কী অসীম দয়া, কি অদ্ভুত ক্ষমা! আর মা—তাঁর তো তুলনাই হয় না—সাক্ষাৎ জগদম্বা। এমনো শুনেছি, একজন এসে মায়ের কাছে এক ছেলের নামে বলেছিল যে, সে অশ্রাব্য ও মহাঘৃণ্য অপরাধ করেছে। মা খুব গম্ভীরভাবে সব শুনলেন। তারপর সে লোকটি মাকে অনুরোধ করে যখন বলল—'আপনি যদি তাকে ডেকে একটু বলে দেন তা হলে ভাল হয়।' তাতে মা বলেছিলেন—'বাবা, তোমরা ও-রকম বলতে পার, কিন্তু আমি যে মা। আমার কাছে সকলেই সমান। সে তোমাদের কাছে মহা অপরাধী ও ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু তার মার কাছে নয়। আমি মা হয়ে কি করে ছেলেকে ঘৃণা করব?' এমন ক্ষমা ছিল মায়ের! এ-সব তো আমাদের চোখের উপরেই হয়ে গেছে। আমরাও ঐ শিখেছি। ঠাকুর, মা, স্বামীজী—এঁদের জীবন দেখেই তো আমাদের শিখতে হবে।—বলিতে বলিতে মহাপুরুষজীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল; তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনে গান ধরিলেন—

'গাওরে জগপতি জগ-বন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতকনাশন।
একদেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা, বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ ভকত করজোড়ে, বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে।।'

বেলুড় মঠ

৩০ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৬—১৫ অগস্ট, ১৯২৯

একজন ভক্ত ওকালতি করেন; পূজনীয় মহাপুরুষজী তাঁহাকে খুবই স্নেহ করেন। ভক্তটি আসিয়া প্রণামান্তে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং নিজ সাধন-ভজন সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

ভক্ত—মহারাজ, প্রাণে শান্তি তো হচ্ছে না, সর্বদা ভেতরটা যেন হু-হু করছে।

মহারাজ—তাঁর নাম করে যাও, বাবা, ক্রমে শান্তি পাবে। আর বেশি না পারো, সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম করে জপ করতে বসবে।

ভক্ত—তা তো করি, কিন্তু তাতে তো আর প্রাণের আশা মেটে না। ইচ্ছে হয় আরো করি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নে। সকাল-সন্ধ্যায় যখন জপধ্যান করতে বসি, তখন খুবই আনন্দ পাই। এত আনন্দ পাই যে, আর ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কি করি, কাজের তাড়ায় উঠতে হয়।

মহারাজ—তার আর কি করবে বল? তখন মনে মনে তাঁর স্মরণ মনন করবে। তিনি তো অন্তর্যামী, তিনি তোমার প্রাণের ব্যাকুলতা টের পাচ্ছেন। তিনি তোমায় কৃপা করছেন, এবং আরো করবেন। তোমার প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করবেন। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁর কাছে যে যা চায়, তিনি তাকে তাই দেন। তুমি প্রাণভরে তাঁর নাম করে যাও। তাঁর নাম, তাঁর ধ্যান কর খুব প্রাণভরে। যখনই সময় পাবে, তখনই স্মরণ মনন করবে। তাঁর স্মরণ-মননের আর সময় অসময়, কালাকাল, স্থান অস্থান নেই। আর প্রার্থনা করবে খুব ব্যাকুলভাবে—'প্রভু, দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর। তুমি কত লোককে দেশ বিদেশে কৃপা করছ আর আমায় করবে না? তোমারই এক সন্তান (নিজকে উদ্দেশ করিয়া) তোমায় ডাকতে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তো সেই ভাবেই তোমায় ডাকছি তোমার কৃপা পাবার জন্য। তোমারই সন্তান এই ভাবে ডাকতে বলে দিয়েছেন।' এই ভাবে ডেকে যাও, নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করবেন। আমরা তাঁর দাস। দেহ, মন, প্রাণ তাঁর চরণে বিকিয়ে দিয়েছি। আমি বলছি, তিনি তোমায় কৃপা করবেন।

ভক্ত—(সাশ্রুনয়নে) আপনি কৃপা করুন, আপনি ঠাকুরকে একটু বলুন, তবেই হবে।

মহারাজ—আমার কৃপা তো আছেই বাবা, নইলে এত বলছি কেন? ঠাকুর এসেছেন জীব উদ্ধারের জন্য। আমরা তাঁর দাস, আমাদেরও তা ছাড়া অন্য কামনা নেই। সাধন-ভজন যা কিছু বল, সবই জগতের কল্যাণের জন্য করছি। নইলে নিজের জন্য আর কি দরকার। তিনি তো আমাদের পূর্ণ করে দিয়েছেন সব রকমে। কিছুই তো আর অপূর্ণ রাখেননি। তবু জীবের কল্যাণের জন্য সাধন-ভজন করিয়ে নিচ্ছেন।

ভক্ত—ধ্যান কি করে করব? ঠাকুরের পুরোপুরি মূর্তি তো ধ্যান করতে পারি নে।

মহারাজ—তা না পারো, ঠাকুরের এক এক অঙ্গ ধ্যান করবে। প্রথমত শ্রীচরণ ধ্যান করলে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পরে ঠাকুরের মূর্তি সমস্তটা একেবারে ধ্যানে আনবার চেষ্টা করবে। পুরোপুরি সমস্ত মূর্তি ধ্যান করতে পারলেই ভাল।

ভক্ত—মার মূর্তি ধ্যান করতে পারি নে—কেমন যেন ভয় হয়। ঠাকুরকে ধ্যান তবু কতকটা হয়।

মহারাজ—তা বেশ তো। ঠাকুরের ধ্যান করতে পারো তো? তাতেই হবে। মার ধ্যান আলাদা না করতে পারলেও দোষ নেই, কারণ ঠাকুরের ভেতরই সব আছেন। মাও আছেন। ঠাকুর হলেন সমস্ত দেবদেবীর ভাবঘন মূর্তি। এ যাবৎ যত দেবদেবী হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো যত দেবদেবী হবেন, সে-সমস্তই ঠাকুরের ভেতর রয়েছেন। অতএব ঠাকুরকে ধ্যান করলেই সকলকে ধ্যান করা হলো। অবশ্য এই consciousness (জ্ঞান) ভেতরে থাকা চাই।

ভক্ত—জপ কিভাবে করব, মহারাজ?

মহারাজ—জপ মনে মনে করাই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। মন মন জপে তো বলিহারি যাই।।' এই 'মন মন জপ'ই সর্বোৎকৃষ্ট। মালাজপ বা করজপ করতে গেলে, সংখ্যা রাখবার দিকে একটু নজর থাকে। তাতে ষোল আনা মন জপের দিকে দেওয়া যায় না, concentration-এর (একাগ্রতার) একটু ব্যাঘাত হয়। খুব প্রেমের সঙ্গে নাম করবে, সংখ্যায় কি আসে যায়? একি বাজারের জিনিস যে এত টাকা, এত দাম—সেই টাকা গুণে দিয়ে জিনিস কিনে নিয়ে এলুম? ভগবান দেখেন ভাব। তিনি দেখেন প্রাণের টান। তাঁর উপর যদি প্রেম হলো, তবে আর কিছুরই দরকার নেই। প্রেমের সঙ্গে যদি একটিবারও তাঁর নাম করা যায়, তাতে মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। প্রেমের সহিত একবার নাম করলেই তা লক্ষ জপের চেয়ে বেশি হলো। একবার ঠাকুরঘরে গিয়েছিলে?

ভক্ত—না, মহারাজ, এবার যাব।

মহারাজ—নিশ্চয় যাবে। তাঁর স্থানে এসেছ, আগে তাঁর দর্শন করতে হয়। যাও, ঠাকুরঘরে যাও। ওখানে বসে একটু জপ কর, আনন্দ পাবে। আমাদের ঠাকুর বড় জীবন্ত ঠাকুর। এখানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। অবশ্য তিনি সর্বত্রই আছেন, তবু এস্থানে ও তাঁর ভক্তদের ভেতর তাঁর বিশেষ প্রকাশ। একটু প্রসাদ নিতে ভুলো না।

বেলুড় মঠ

২ ভাদ্র, রবিবার, ১৩৩৬—১৮ অগস্ট, ১৯২৯

তীর্থাদি-ভ্রমণের কথা উঠিয়াছে। একজন সন্ন্যাসী সম্প্রতি ঁবদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল।

মহাপুরুষজী বলিলেন—তীর্থাদি-ভ্রমণ—ও তো সোজা কথা। একটু কঠোরতা করতে পারলেই হলো। কিন্তু ভগবানে ভক্তি, বিশ্বাস লাভ করা—সে অতি দুর্লভ। অনেক অনেক সব সাধু দেখতে পাবে, যারা হেঁটে চার ধাম ঘুরেছে, আরো কত কি করেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক অনুরাগী সাধু—ঠিক ঠিক বিবেকী সাধু—কজন? অবশ্য একেবারে যে নেই, তা নয়; আছে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। ভগবানের দিকে এগুনো খুব কঠিন। প্রথমত যাদের জীবনে কোন living ideal (জীবন্ত আদর্শ) নেই, তাদের পক্ষে তা তো মহা দুরূহ ব্যাপার। ভাগ্যক্রমে কোন ideal personality-র (আদর্শ মানবের) touch-এ (সংস্পর্শে) যদি আসে তো কতকটা সোজা হয়, নইলে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সেদিকে এগুতে লোক বড় একটা পারে না। জীবনের ideal (আদর্শ) ঠিক করতে পারলে তখন আস্তে আস্তে ভগবৎ-কৃপায় সেদিকে এগুতে পারে। অবশ্য সবই নির্ভর করে তাঁর কৃপার ওপর। আমরা খুব fortunate (ভাগ্যবান) যে, অত বড় এক personality-র (মহামানবের) touch-এ (সংস্পর্শে) এসেছিলুম। ভগবান লাভ করতে হলে কি কি করতে হয়, ভগবান লাভ হলে মানুষ কেমন হয়, এ-সব নিজ জীবনে দেখেছি। তিনি যুগাবতার হয়ে এসেছিলেন এবং কৃপা করে আমাদের সঙ্গে করে এনেছিলেন। একি কম সৌভাগ্যের কথা? আমরা স্বয়ং ভগবানের direct touch-এ (সাক্ষাৎ সংস্পর্শে) এসেছি। আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর আদর্শে জীবন গঠন করেছি। আমাদের পক্ষে ভগবানলাভের রাস্তা খুব সোজা হয়ে গেছে। আমরা ধন্য। আবার যারা ঠাকুরকে দেখেনি, তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করতে পারেনি, কিন্তু আমাদের দেখছে, আমাদের ভেতর দিয়ে ঠাকুরকে ধরবার ও বোঝবার চেষ্টা করছে, তারাও জগতের কোটি কোটি নরনারীর চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। কি বলছো হে! স্বয়ং ভগবান নরদেহ ধারণ করে এসেছিলেন—এই তো সেদিনের কথা। আমাদের চোখের উপর সব কাণ্ডটা হয়ে গেল। কি কঠোর সাধনার অগ্নিই না তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন! এখনো তার আঁচ লোকের গায়ে লাগছে। একি কম যুগ! এ মহাপুণ্য সময়। এ যুগে যেই রামকৃষ্ণ নাম নেবে, তাঁর জীবনকে আদর্শ করে ভগবানলাভের রাস্তায় এগুবে, তাঁর পক্ষেই সব সহজ হয়ে যাবে। এখন রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শে যদি কেউ নিজ নিজ জীবন গড়ে তোলে, তাঁর জীবনছাঁচে যদি নিজেদের জীবন ঢালাই করে নেয়, তবে তো তার পক্ষে ভগবান লাভ করা অতি সোজা। কিন্তু তা লোক পারছে কোথায়?

সন্ন্যাসী—মহারাজ, ভগবান লাভ করা কি খুব সোজা?

মহারাজ—খুব সোজা নয়।

এই বলিয়া গান ধরিলেন,

'শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ি।

ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেঁসে দাও মা হাত চাপড়ি।'

'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।'

—সহস্র লোকের মধ্যে এক-আধ জনই সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করে। আবার প্রযত্নশীল সাধকগণের মধ্যেও এক-আধ জনই আমাকে যথার্থভাবে জানিতে পারে। ভগবান লাভ করা খুব কঠিন ব্যাপার এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা না হলে তা হবারও জো নেই। তাঁর কৃপা হলো তো সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধকার ঘরেও দপ করে আলো জ্বলে উঠতে পারে। তিনি কৃপাসিন্ধু। জীবের দুঃখে কাতর হয়েই তো জীব উদ্ধারের জন্য তিনি নরদেহ ধারণ করে এসেছিলেন। নইলে তাঁর কি প্রয়োজন? বল না? তিনি তো পূর্ণ, তাঁর কিসের অভাব?

বেলুড় মঠ

১১ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৩৬—২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

আজ দ্বিপ্রহরের একটু পূর্বে দক্ষিণেশ্বর হইতে শিবুদাদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আসিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে মা-কালীর প্রসাদ ও সিন্দূর দিয়া গেলেন। বিকালে বিশ্রামাদির পর শিবুদাদা মহাপুরুষজীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে (পূর্ব নির্দিষ্ট আসনে) বসিতে বলিয়া পরে বলিলেন—কাল তোমার কথা খুব ভাবছিলুম। দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথাও মনে পড়ে গেল। তুমি ভক্তি করে মার সেবাটি কর কিনা তাই বিশেষ করে তোমার কথা মনে হয়।

শিবুদাদা—তাই তো আপনার টানে এসে পড়েছি। আপনি টেনেছেন, তাই এসেছি।

মহারাজ—তুমি, দাদা, খুব ভক্তি করে মার পূজাটি কর। ভক্তি-বিশ্বাস না থাকলে খালি পুজোতে কিছুই হয় না। ভক্তি-বিশ্বাসের জোরেই মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হয়ে ওঠে। এই দেখ না, ঠাকুরের ভক্তির জোরেই দক্ষিণেশ্বরে 'মা' জেগে উঠেছিলেন। নইলে মা-কালীর মূর্তি তো অনেক মন্দিরেই আছে, কিন্তু সব মন্দিরেই কি মা চিন্ময়ী হয়ে আছেন? তোমরাও যদি খুব ভক্তি করে মার পুজোটি কর, তবে তো মা জাগরূক থাকবেন। ঠাকুর যে বংশে জন্মেছিলেন, তোমরা সেই বংশের লোক। তোমরা কি কম? তোমাদের ভেতর

সেই ঠাকুরের রক্ত রয়েছে, তোমাদের উপর মার বিশেষ কৃপা। দক্ষিণেশ্বরের মা-কালী খুব জাগ্রতা দেবী, ওখানে মার বিশেষ প্রকাশ।

শিবুদাদা—তা আপনাদের আশীর্বাদে ও মার কৃপায় একটু একটু বুঝতে পারছি। প্রথম প্রথম যখন পূজাকার্যে ব্রতী হয়েছিলুম, তখন তো পূজাদি বিশেষ কিছু জানিনে, মনে মনে ভয় হতে লাগল। আর কিসের পরে কি পুজো করতে হয়, তাও জানতুম না। কিন্তু দেখেছি, মার কাছে খুব প্রার্থনা করে পুজোয় বসতুম, আর স্পষ্ট শুনতে পেতুম, কে যেন বলে বলে দিচ্ছে, 'এর পরে এই কর, এখন দশমহাবিদ্যার পুজো কর।' এই রকম সব কথা কেউ যেন বলে দিতেন। এমন স্পষ্ট শুনতে পেতুম যে, চারদিকে তাকিয়ে দেখতুম, কে কোত্থেকে বলছে।

মহারাজ—তাই তো! দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর মতন এমন জাগ্রতা দেবী আর নেই। ঠাকুর নিজ ভক্তিবলে মাকে জীবন্ত করে রেখেছিলেন। ঠাকুরের সব লীলা তো দেখেছ, দাদা? যখন পুজোটি করবে, সেই সময় এইটেও সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করবে যে, মা জীবন্ত আছেন।

শিবুদাদা—তার প্রমাণও যথেষ্ট পেয়েছি। যখন ছেলে-বয়সে পুজো করতে আরম্ভ করেছিলুম, তখন রোজই রাত্রে শোবার আগে জগদম্বাকে বলে যেতুম, 'মা, এখন আমি শুতে যাচ্ছি। এখন তো গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো, সকালে ঘুম ভাঙে কি না ভাঙে কে জানে। তুমি কিন্তু আমাকে মঙ্গলারতির আগে তুলে দিও।' তা মা রোজই আমাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিয়ে বলতেন, 'যা, ওঠ, এবার মঙ্গলারতির সময় হয়ে এলো।' আরো কত কি মা কৃপা করে দেখিয়েছেন!

এই প্রকার অনেক কথাবার্তার পর শিবুদাদা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি চলিয়া গেলে মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা! শিবুদা কেমন সরল! ওর ওপর মা-র খুব কৃপা আছে। সরল প্রাণে শীঘ্র মায়ের প্রকাশ হয়।

বেলুড় মঠ

১২ আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৬—২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

বিকালবেলা, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। বাংলার কোন এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দুইজন কর্মী-ভক্ত অনেকক্ষণ যাবৎ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া লোকজনের সহিত দেখাশুনা খুব কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে সেই কর্মিদ্বয়কে তাঁহার কাছে আনা হইল। তাহারা প্রণাম করিয়া বলিল—মহারাজ, আপনার নিকট কিছু উপদেশ নিতে

এসেছি। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তান, আমাদের আশীর্বাদ করুন। আর যদি অনুমতি করেন তো আমাদের দু-একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, তা বলি।

মহারাজ—বেশ তো, কি বলবার আছে বল না?

ভক্ত—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। স্থূল শরীরে বর্তমান থাকা কালে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে একটা সঙ্ঘ বা group তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনালব্ধ সমস্ত শক্তিই যেন সেই সঙ্ঘের মধ্যে নিহিত করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্ঘ এখনো চলছে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কি করে তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন, কি বন্ধনে তিনি সকলকে একত্র করেছিলেন?

মহারাজ—প্রেমই একমাত্র বন্ধন। তিনি প্রেমসূত্রে সকলকে একত্র গেঁথে রেখেছিলেন। আমরা সকলে তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েই তাঁর কাছে এসেছিলুম এবং পর পর একত্র হয়েছিলুম। তাঁর এত ভালবাসা ছিল যে, তার তুলনায় পিতা, মাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতো। এখনো তাঁর সেই সঙ্ঘ প্রেমের দ্বারাই চালিত হচ্ছে। এখানে প্রেমই একমাত্র common cord (সংযোগসূত্র), যদ্দ্বারা সকলে একত্র গ্রথিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আছে।

ভক্ত—আচ্ছা, যে প্রেমশক্তির ডোরে ঠাকুর আপনাদের সকলকে একত্র করেছিলেন এবং আপনাদের ভেতর যে প্রেমশক্তি ঠাকুর দিয়েছিলেন, সে প্রেমশক্তি তো কালপ্রবাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, এবং হবেও। এখন সেই শক্তির অখণ্ডত্ব কি করে রক্ষা করা যাবে? কি উপায়ে সেই শক্তিধারাকে বহুকাল জগতের কল্যাণের জন্য অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত রাখা যায়?

মহারাজ—দেখ, এ নশ্বর জগতে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। কোন শক্তিই চিরকাল সমভাবে কার্যকরী থাকে না। শক্তির গতি কেমন জানো? ঠিক wave-এর (ঢেউয়ের) মতো। wavelike motion-এ (তরঙ্গায়িত গতিতে) শক্তি খেলা করে। কখনো অতি বেগে খুব উঁচুতে ওঠে, আবার কখনো মন্দগতিতে নিম্নদিকে যায়। এই চিরকাল হয়ে আসছে। আর ঐ যে মন্দগতি, ওই ভবিষ্যতে বেগশালী গতির সূচনা করছে। আর কি করে যে সেই শক্তিকে অব্যাহত রাখা যায় তা মানুষ কি করে জানবে? কেবল মা-ই জানেন। যে মহাশক্তি হতে এ জগতে শক্তির উদ্ভব হচ্ছে, একমাত্র তিনিই জানেন কি করে ঐ শক্তিকে রক্ষা করা যায়। যে আদ্যাশক্তি মহামায়া জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর শক্তির অবতারণা করেন, তিনিই জানেন কি করে এবং কতদিন সেই শক্তিকে বেগবতী রাখবেন। আমাদের দিক থেকে তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় আর নেই।

ভক্ত—আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনের আদর্শ করেছি। তাঁরই ভাবে

নিজেদের জীবন গঠন করতে চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি। আপনি আমাদের একটু আলোক দান করুন, আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

মহারাজ—বাবা, তোমরা ধন্য যে শ্রীরামকৃষ্ণকে তোমাদের জীবনের আদর্শ করেছ। তিনিই এই যুগের ঈশ্বর। যে তাঁর শরণাপন্ন হবে, তারই কল্যাণ হবে। আমি খুব আশীর্বাদ করছি, তোমরা শক্তিলাভ কর, ধন্য হয়ে যাও। মানব জীবন সার্থক হোক তোমাদের। আর যে, বাবা, আলোকের কথা বললে, সে আলোক আসবে ভেতর থেকে। যত ভেতরে যাবার চেষ্টা করবে, যত অন্তর হতে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করবে, ততই আলোক দেখতে পাবে। আলোক বাইরে কোথাও নেই। সব ভেতরে, সব ভেতরে। সেই আলোকরূপিণী মা সকলের ভেতরেই আছেন। আমার, তোমার সকলের ভেতরেই আছেন। ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু, স্থাবর-জঙ্গম সর্বত্র তিনি। সেই আদিভূতা মহামায়ার কাছে প্রার্থনা কর; সব চাবিকাঠি তাঁর হাতে। তিনি একটু কৃপাদৃষ্টি করে চাবি খুলে দেন তো আলোর রাজ্য খুলে যবে। সেই চৈতন্যরূপিণী সর্বনিয়ন্ত্রী আদ্যাশক্তিই মন, বুদ্ধি, অহংকার সকলের কর্ত্রী, সর্ব জগতের আকর। সেই মা-র ভেতর থেকেই আমরা সকলে এসেছি, আবার তাঁতেই লয় হয়ে যাব।

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।।'

আর সেই আদ্যাশক্তি, সেই ব্রহ্মশক্তি এ মন-বুদ্ধির অগোচর। শুদ্ধ মনে তাঁর প্রকাশ হয়। সাধন ভজন দ্বারা মানুষ তাঁকে ধরতে বা বুঝতে পারে না। তিনি স্বয়ংপ্রভ, তাঁর চৈতন্যশক্তিতেই জগৎ চৈতন্যময়।

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং,
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।'

—'যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নয়, এই বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়াই সমস্ত বস্তু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রকাশ পায়। সমগ্র জগৎ তাঁহারই জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।' তোমরা সেই মাকে ধরে থাকো। তিনি তোমাদের ভেতরেই রয়েছেন। তিনিই তোমাদের আলোর রাস্তা খুলে দেবেন।

ভক্ত—আপনি এই সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী তপস্যা করে কি উপলব্ধি করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের একটু বলুন। আর আপনার আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের সেই আলোর রাস্তা খুলে দিন।

মহারাজ—(সস্নেহে) ঐ যে বললুম, বাবা, সেই আলো তোমাদের ভেতরেই আছে। ভেতরে ডুবে যাও, তবেই আলোর সন্ধান পাবে।

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন।।'

যত দিন যাচ্ছে ততই ঐ ভাব আরো বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে। ওছাড়া আর পথ নেই। সব ভেতরে। তাই তো ঠাকুর গাইতেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।
পরমধন সেই পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।।'

তাই তো বলছি, বাবা, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে। এইটেই সার উপদেশ। মা-র শরণাগত হও। ব্যাকুল হয়ে বালকের মতো কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। তবেই আলোক দেখতে পাবে। আমরাও ঠাকুরকে যখনই জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তখনই আমাদের বলেছেন, 'ওরে মার কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি রাস্তা পরিষ্কার করে দেবেন।' তিনি বারংবার আমাদের ঐ উপদেশই দিয়েছেন। আমিও, বাবা, তোমাদের বলছি—কাঁদ, প্রার্থনা কর। 'মা, দেখা দাও, দেখা দাও' বলে কাঁদ। দেখবে মা আনন্দময়ী তোমাদের প্রাণে আনন্দ ও শান্তি দেবেন, নিশ্চয়ই দেবেন।

ভক্ত—সে তো খুবই সত্য কথা যে, সেই আলোক ভেতর থেকেই আসে। কিন্তু সেই আলোক লাভ করতে গেলে বহিঃশক্তির সাহায্যও তো দরকার। গুরুশক্তিরও তো প্রয়োজন আছে। আমরা আপনার কাছে সেই শক্তি ভিক্ষা করছি।

মহারাজ—আমি খুব আন্তরিক আশীর্বাদ করছি যাতে তোমাদের প্রাণে শান্তি আসে। আর সেই শান্তিধামে পৌঁছবার রাস্তাও তোমাদের বলে দিলাম। কিন্তু সব করতে হবে তোমাদের। বাইরে থেকে আসবে কেবল suggestion (উদ্দীপন) আর বাকি সব নিজেকেই করে নিতে হয়। গুরুশক্তিটা হলো সেই suggestion (উদ্দীপন)। যত তাঁর দিকে এগুবে ততই রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাবে।

ভক্ত—মহারাজ, আর একটা প্রশ্নের মীমাংসা আপনাকে করে দিতে হবে। স্বামী সারদানন্দ-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' পড়েছি যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কঠোর সাধনার পর নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভের পর যখন তিনি জগন্মাতার নির্দেশানুসারে লোককল্যাণ সাধন করছিলেন, তখন তিনি শাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা পত্নীকেও নিজের কাছে রেখেছিলেন, এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের ন্যায় ঠাকুর তাঁকেও কাছে রেখে সর্বপ্রকারে শিক্ষাদীক্ষাদি দিয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী করেছিলেন। এই যে ঠাকুরের জ্ঞানলাভের পর ভক্তদের সঙ্গ করা এবং নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে কাছে রাখা—এ দ্বারা কি সূচিত হচ্ছে? ঠাকুর যুগাচার্য। যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য এ জগতে এসেছিলেন এবং নিজ জীবনাদর্শে যুগধর্মের নির্দেশ করে গিয়েছেন। তাঁর নিজ

জীবনের দ্বারা তিনি future generation-এর (ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের) জীবনধারা কি ইঙ্গিত করেননি?

মহারাজ—হাঁ, শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুরের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে খুব যত্ন করে কাছে রেখেছিলেন এবং অতি যত্নে তাঁকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, উৎসাহিত করতেন এবং সব রকমে তাঁর সাহায্য করতেন। কিন্তু ঠাকুর তা করেছিলেন নির্বিকল্প সমাধি-লাভের পর। সেই সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের যা বলেছিলেন তা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। ঠাকুর বলতেন, 'কালী-মন্দিরে যে মা আছেন, এর ভেতরে (নিজের শরীর দেখিয়ে) সেই মা-ই বিরাজ করছেন, এবং সেই মা-ই (শ্রীশ্রীমার রূপে) আমার কাছে রয়েছেন।' এখন ঠাকুর কেন ওরূপ করেছিলেন তা, বাবা, আমরা কখনো বুঝতে চাইনি, চেষ্টাও করিনি। সে তোমরা বুঝতে পার তো বোঝ। ঠাকুর ওরূপ করেছিলেন, এই পর্যন্ত আমরা জানি। ভগবান স্বয়ং নরদেহ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন। তাঁর কাজের উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধির অসাধ্য। আর তা বোঝবার প্রবৃত্তিও কখনো হয়নি। স্বামীজী যখন বিশ্ববিজয়ী হয়ে আমেরিকা হতে এদেশে ফিরে এলেন, তখন একদিন গিরিশবাবু স্বামীজীকে বললেন, 'দেখ, নরেন, আমার বিশেষ অনুরোধে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।' গিরিশবাবু স্বামীজীকে খুব ভালবাসতেন কিনা, তাই এমনভাবে কথা বলতেন। স্বামীজী খুব আগ্রহের সহিত বললেন, 'আপনি এমন করে বলছেন কেন? কি করতে হবে বলুন না।' গিরিশবাবু তখন বললেন, 'তোমাকে ঠাকুরের একটি জীবনী লিখতে হবে।' তখন স্বামীজী হঠাৎ যেন দুহাত পেছিয়ে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখুন, গিরিশবাবু, আমাকে ঐ অনুরোধটি করবেন না। ও কাজ ছাড়া আমাকে আর যা কাজ বলবেন আমি তাই আনন্দে করব। যদি পৃথিবী ওলটপালট করে ফেলতে বলেন তো সেও আচ্ছা, কিন্তু ঐ কাজটি পারবো না। তিনি এত মহান ছিলেন, এত বড় ছিলেন যে, আমি তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবনের এক কণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে ফেলব? আমি তা পারব না।' স্বামীজীর মতো অত বড় আধার—তিনিই ঠাকুরের কার্যকলাপ কিছু বুঝতে পারেননি, আমাদের কথা তো কোন ছার। আমরা ওসব বুঝবার চেষ্টাও করিনি। তাঁকে জানা কি মানুষের সাধ্যায়ত্ত? দেখ তোমরা যদি কিছু বুঝতে পার। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সব জিনিস বুঝবার চেষ্টা করে থাকে। আমরা বলি, 'ঠাকুর, তোমায় জানতে চাইনে, কেবল এই কর যাতে তোমার শ্রীচরণে আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস অচল অটল থাকে।' তা তিনি কৃপা করে আমাদের প্রার্থনা শোনেন।

ভক্ত—মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন আমাদেরও তাই হয়, জীবনে যেন শান্তি লাভ করতে পারি।

মহারাজ—তা, বাবা, খুব আশীর্বাদ করছি। তোমাদের খুব জ্ঞান বেড়ে যাক, তোমরা খুব আনন্দে থাকো, আর সাধ্যমত দেশের কল্যাণকর কাজ কর। আন্তরিক খুব প্রার্থনা

করছি (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) তোমাদের জন্য। তোমরা খুব বেড়ে যাও, খুব বেড়ে যাও। ভগবানের দিকে খুব এগোও।

ভক্তদ্বয় বারংবার মহাপুরুষজীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহারা পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরিয়া যাইতেছেন।

বেলুড় মঠ

১২ কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৩৬—২৯ অক্টোবর, ১৯২৯

বিকালবেলা, প্রায় ৫টা বাজিয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। শরীর ভাল নয়। কয়েক দিন ধরিয়া সর্দি, হাঁপানি এবং মাঝে অল্প অল্প জ্বরও হইয়াছিল। বেশি কথা বলিতে কষ্ট হয়, কিন্তু লোকের ব্যাকুলতা ও দুঃখকষ্টের কথায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না—নিজ দেহের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া কি করিয়া তাহাদের প্রাণে একটু সান্ত্বনা ও শান্তি দিবেন, তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ আসিয়াছেন, সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র ও একটি বিধবা কন্যা। প্রণাম করিয়া সকলে দাঁড়াইলে মহারাজ খুব সস্নেহে তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন। একখানা মাদুর পাতা ছিল, তাঁহারা তাহাতে উপবেশন করিলেন। সামান্য একটু কথাবার্তার পর ভদ্রলোকটি নিজ কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন—এটি আমার মেয়ে। সম্প্রতি এর স্বামী মারা গেছে, খুব শোক পেয়েছে। এখনো শোক সামলাতে পারেনি, তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ 'আহা! আহা!' করিতে লাগিলেন এবং খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—সংসারের ধারাই এই, মা। শোকতাপ, দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা—এই নিয়ে সংসার। প্রকৃত সুখশান্তি সংসারে অতি বিরল। আর এই যে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ, তা কেউ রোধ করতে পারে না। এতে মানুষের কোন হাত নেই। ভগবানই এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা। আর তাঁরই ইচ্ছায় জীব এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে থাকে। তিনি যতদিন রাখবার ততদিন রাখেন, আবার যখনই ইচ্ছা নিয়ে যান। এই জ্ঞানটি পাকা করতে হবে যে, জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর কর্তা একমাত্র ভগবান। তিনিই জীবকে এ সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব-রূপে পাঠান, আর যতদিন ইচ্ছা জীবকে কোন-না-কোন সম্বন্ধে জড়িত করে রেখে দেন; আবার যখনই ইচ্ছা তখনই নিয়ে যান। যতক্ষণ মানুষের এই জ্ঞানটা পাকা না হবে, ধারণা না হবে, ততদিনই তাকে শোকসন্তপ্ত হতে হবে। কিন্তু এই জ্ঞান, এই ধারণা পাকা হলে, দৃঢ় হলে আর শোকতাপ হয় না, দুঃখ করবারও কিছু থাকে না। তবে এইটুকু দেখতে হবে যে, ভগবান যাদের আমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করে রেখেছেন, তাদের সেবার কোন

ত্রুটি হয় কি না। যদি তা হয় তো তার জন্য দুঃখ করতে হবে। আর কেবল শোক করাই মানুষের তো একমাত্র কাজ নয়; আরো ঢের ঢের কাজ আছে। সংসারের কাজ-কর্ম তো আছেই—তা ছাড়া জীবনের লক্ষ্য যা, সেদিকেও এগুতে হবে। নইলে কেবল হা-হুতাশ ও শোক করলে কি হবে? শোক করবার জন্য তো জীবন নয়? সেই জন্ম, জরা, মৃত্যুর পরপারে যেতে হবে, সেই পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানকে লাভ করতে হবে, এবং তখনই হবে সব দুঃখের অবসান।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো না দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।'

—'যাহা (যে আত্মসাক্ষাৎকার) লাভ করিয়া মানুষ অন্য কোন লাভকে অধিকতর জ্ঞান করে না এবং যে অবস্থাতে স্থিত হইয়া মানব অতি গভীর দুঃখেও বিচলিত হয় না।'—দুঃখ-কষ্টকে প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের আশীর্বাদজ্ঞানে সানন্দে বরণ করে নিতে হয়। ভগবানের একান্ত শরণাগত না হলে জীব এ-সব শোকতাপ অবিচলিতভাবে সহ্য করতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করা খুবই কঠিন কথা। ঠিক ঠিক ভক্ত একমাত্র ভগবৎবিশ্বাসের বলেই জাগতিক শোকতাপে অভিভূত হয় না। আর মানবজীবনের লক্ষ্যও তো তাই—সেই শুদ্ধা ভক্তি শুদ্ধ প্রেম লাভ করা, ভূমানন্দের অধিকারি হওয়া। ভগবানের দিকে এগিয়ে যাও, মা। যতই তাঁর দিকে এগুবে ততই শান্তি। অনিত্য এ সংসার। এ সংসারে কোন কিছুতেই শান্তি নেই, ভগবানের শ্রীচরণই একমাত্র শান্তিধাম।

বেলুড় মঠ

১৫ কার্তিক, শুক্রবার, ১৩৩৬—১ নভেম্বর, ১৯২৯

পূর্বরাত্রে মঠে খুব সমারোহের সহিত ৺কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। সারারাত্রি পূজা, পাঠ, ভজন-কীর্তনে সমগ্র মঠ মুখরিত ছিল। কলিকাতা হইতেও অনেক সাধু ও ভক্ত মঠে পূজার আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি সাড়ে নটায় মায়ের পূজা আরম্ভ হয় এবং শেষ হইয়াছিল ভোর পৌনে ছয়টায়। পূজান্তে ঐ হোমাগ্নিতে সপ্তশতী হোমও করা হয়।

সমস্ত রাত্রি মহাপুরুষজীও পূজার আনন্দে ভরপুর ছিলেন। রাত্রে বহুবার সেবকদের পাঠাইয়া ৺পূজার সব খবর নিয়াছিলেন। কালীকীর্তনের সময় তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়াছিলেন। যখন 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। / কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়' ইত্যাদি গানটি গাওয়া হইতেছিল, তখন তিনি বলিলেন— আহা, এ গানটি ঠাকুর খুব গাইতেন। তিনিও সমস্ত গানটি সঙ্গে সঙ্গে গাহিলেন।

সকালবেলা মহাপুরুষজী নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। সাধু ও ভক্তগণ একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার ঘরে সমবেত হইলেন। গতরাত্রির পূজার আনন্দে তখনও তিনি মাতোয়ারা। প্রতিটি কথায়, প্রত্যেক ব্যবহারে হৃদয়ের সেই আনন্দের অভিব্যক্তি হইতেছিল। খানিক পরে তাঁহার জন্য মায়ের পূজার প্রসাদাদি আনা হইল। প্রসাদ দেখিয়া ভারি আনন্দ। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এ সব তো আমার কিছুই চলবে না। দৃষ্টিভোগ করাই সার। ইহা বলিয়া প্রত্যেক জিনিসই এক একবার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রথমে মস্তকে ও পরে জিহ্বায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিলেন—বাঃ, বেশ হয়েছে। মায়ের চমৎকার ভোগ হয়েছে। সেবক প্রসাদের থালা তাঁহার সম্মুখ হইতে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বলিলেন—দেখ, মহাপ্রসাদের বাটিটি কুকুরদের জন্য রেখে দেবে। ওদের তো আর কেউ দেবে না? আহা! ওরাও আশা করে আছে। কত আনন্দ করে খাবে! ইহা বলিয়া 'কেলো কেলো' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

পূর্বরাত্রির পূজার কথা উঠিতেই তিনি বলিলেন—আহা! এখনো সমগ্র মঠ যেন হোমের গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে। হোমের গন্ধ যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত সব পবিত্র হয়ে যায়। আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ! বলিতে বলিতে নিজে নাক দিয়ে সেই গন্ধ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

জনৈক সন্ন্যাসী পূজার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—মহারাজ, কাল খুবই আনন্দ হয়েছিল। এমন আনন্দ বহুদিন হয়নি। ভজনও বেশ জমেছিল রাত প্রায় তিনটে পর্যন্ত।

মহাপুরুষজী—তা হবে না? মা-র পুজো হয়েছে! মা কৃপা করে সকলকে খুবই আনন্দ দিয়েছেন। মা সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হয়ে পূজা গ্রহণ করেছেন। আর এ মা তো যে-সে মা নন, এ যে ঠাকুরের 'মা'। ঠাকুর নিজে মা-কালীকে পুজো করেছিলেন। বেদে যাঁকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, দ্বৈতবাদীরা যাঁকে ঈশ্বর বলে, শাক্তেরা যাঁকে শক্তি বলে, যিনি বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, শৈবদের শিব, তাঁকেই ঠাকুর 'মা' বলতেন। আর সেই মাকে পুজো করেই ঠাকুরের সব রকমের অনুভূতি হয়েছিল। তিনি অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ইত্যাদি সব ভাবেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর এখানকার মতো পুজো আর কোথাও হয় না। এখানে সাধু-ভক্তদের ভক্তির পুজো। যাদের টাকা আছে তারা নানা ঘটা করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে পুজো করতে পারে। কিন্তু এমন ভক্তিভাবে পুজো কোথাও হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা সকলে প্রাণ দিয়ে পুজো করেছে—কত আন্তরিকতা, কত শ্রদ্ধা! মা-র তাতে খুবই প্রীতি। অধিকাংশ লোকেই তো নানা কামনা করে পূজা করে; নিষ্কাম পুজো, ভক্তির পুজো আর কজনে করে? এখানে কারো কোন কামনা নেই, কোন বাসনা নেই, শুধু মায়ের প্রীতির জন্যই এই পুজো। সঙ্গে সঙ্গে কত জপ, ধ্যান, পাঠ, ভজন এসব হয়েছে, আর সব শুদ্ধ সাত্ত্বিক পবিত্র সাধু-ব্রহ্মচারী নিজেরা মা-র পুজোর আয়োজন করেছে। এমনটি, বাবা, কোথাও হয় না। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সাত্ত্বিক পুজো জগতে বিরল।

বেলা প্রায় দশটা। একজন স্ত্রী-ভক্ত আসিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষজীর কৃপাপ্রাপ্ত, তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণতা হইয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মহাপুরুষজী বলিলেন—না, মা, শরীর ভাল নেই। খুবই খারাপ! দিন দিন আরো খারাপের দিকেই যাবে। শরীরের তো একটা ধর্ম্ম আছে। এ দেহের বয়সও তো কম হলো না! এখন ধীরে ধীরে এ দেহের নাশ হবে।

স্ত্রী-ভক্তটি সজলনয়নে বলিলেন—বাবা, আপনি চলে গেলে, আমরা কার কাছে যাব? আমাদের প্রাণ জুড়াবার স্থান আর কোথায়?

মহাপুরুষজী—কেন, মা! ঠাকুর আছেন। তিনি তো তোমার ভেতরেই রয়েছেন। তিনি যে তোমার অন্তরাত্মা—সকলেরই প্রাণের প্রাণ। তাঁকে আশ্রয় কর, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার প্রাণে শান্তি দেবেন, তোমার প্রাণের সব অভাব পূর্ণ করে দেবেন। দেহের নাশ তো একদিন হবেই। কোন দেহই চিরকাল থাকে না। পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে নিশ্চয়। অতএব যিনি চিরসত্য, নিত্য, অপরিণামী, সর্ব্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান, তাঁকেই আশ্রয় কর, তাঁকেই ধরে থাক। তা হলে এ দুস্তর সংসার-সমুদ্রে আর কোন ভয় থাকবে না—অনায়াসে পার হয়ে যাবে।

স্ত্রী-ভক্ত—বাবা, আপনি আমার গুরু; আপনিই আমায় কৃপা করেছেন। আমাদের মনে কত রকম প্রশ্ন, কত সন্দেহ, কত নৈরাশ্য আসে! সে-সব কে মেটাবে? এই তো আপনার চরণপ্রান্তে এসেছি—এখন প্রাণে কত শান্তি, কত আনন্দ! কিন্তু আপনি চলে গেলে যে কি হবে তা ভাবতে প্রাণ কেঁদে ওঠে।

মহাপুরুষজী—দেখ, মা, তোমায় তো সব কথা বলে দিয়েছি—গুরু একমাত্র ভগবান। তিনিই জগদ্‌গুরু। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান জীবকে উদ্ধার করবার জন্য নরদেহ ধারণ করে রামকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন। আমাদেরও তিনি সঙ্গে করে এনেছেন। ঠাকুর পঞ্চাশ বৎসর কাল নর দেহে অবস্থান করে বহু লোককে বহু ভাবে কৃপা করে এক অলৌকিক জীবনাদর্শ সমগ্র জগতের সামনে রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের সার উপদেশ, যা তিনি সমগ্র জীবনব্যাপী দেখিয়ে গেছেন, তা হলো—জগৎ অসত্য, অনিত্য; একমাত্র ভগবানই সত্য, নিত্য। এখন তিনি সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মভাবে জগতের হিতসাধন করছেন। ভগবদ্ভক্তেরা এখনো ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি তাঁদের দর্শন দেন, নানাভাবে কৃপা করেন। আমাদের তিনি এখনো স্থূলদেহে রেখেছেন। এ দেহ নষ্ট হয়ে গেলে আমরাও চিন্ময় দেহে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে অবস্থান করব। আমরা যাদের আশ্রয় দিয়েছি, তাদের ইহকাল ও পরকালের সব ভার আমাদের নিতে হয়েছে। ভক্তেরা পবিত্রহৃদয়ে ব্যাকুলভাবে ডাকলে আমাদের দেখাও পাবে—যেমন এখন দেখতে পাচ্ছ, তার চাইতে আরো জীবন্ত ও স্পষ্টভাবে। অতএব, মা, এখন হতে অন্তরে দেখবার চেষ্টা কর। বাইরের দেখাশুনা আর কদিনের?

স্ত্রী-ভক্ত—তাই আশীর্বাদ করুন, বাবা, যাতে আপনাকে অন্তরে বাইরে সর্বত্র দর্শন করতে পারি।

মহাপুরুষজী—তা পাবে। খুব ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকলেই দেখতে পাবে। তবে খুব ব্যাকুলতা না হলে হবে না।

স্ত্রী-ভক্ত—বাবা, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মচর্য পালন না করলে ভগবান লাভ হয় না। ব্রহ্মচর্য-পালন ব্যতিরেকে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। এখন সেই ব্রহ্মচর্য কিভাবে পালন করতে হবে, তা আপনি দয়া করে বলে দিন। খাওয়া-দাওয়ায় খুব কঠোরতা করব কি?

মহাপুরুষজী—না, মা, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম কিছুই করতে হবে না। তবে ওরই মধ্যে একটু দেখেশুনে খেলেই হলো। নেহাত যে-সব জিনিস খুব উত্তেজক, তা নাই বা খেলে। কেবলমাত্র রসনার তৃপ্তিসাধনই তো আহারের উদ্দেশ্য নয়। শরীরধারণের জন্য আহার, আবার শরীরধারণের উদ্দেশ্য হলো ভগবানলাভ। যে-সকল খাবার মনকে চঞ্চল করে, মনকে ভগবন্মুখী হতে দেয় না, সে-সকল খাবার না খাওয়াই ভাল। কেবলমাত্র আহারের সংযম করলেই যে ব্রহ্মচর্যপালন করা হয়ে গেল তাও নয়। আসলে ব্রহ্মচর্য হলো ইন্দ্রিয়সংযম। তা না করতে পারলে ভগবৎ আনন্দ লাভ করা সুদূরপরাহত। তুচ্ছ রক্তমাংসের তৈরি দেহের আনন্দ না ছাড়তে পারলে সেই ব্রহ্মানন্দলাভ কি কখনো সম্ভব? তোমরা সংসারে রয়েছ। ঠাকুর সংসারীদের জন্য ভগবানলাভ করার পন্থা কত সোজা করে গেছেন। ঠাকুর বলতেন যে, দু-একটি সন্তান হবার পর স্বামী-স্ত্রীতে ভাইবোনের মতো থাকবে, দেহের সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে পরস্পরে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে, দুইজনেই যেন ভগবানের সেবক। দেহের সুখভোগের জন্য তো আর জীবন নয়? ভগবানলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম যখন পেয়েছ, তখন জীবনটা বৃথায় যেতে দিও না। আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর। ঠাকুরই হলেন তোমার আত্মা; তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। তিনি তো চৌদ্দপোয়া মানুষটি নন? তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনিই জীবের অন্তরাত্মা। তাঁকে লাভ করলে ভববন্ধন চিরতরে কেটে যাবে, আর এ সংসারে বারবার যাতায়াত করতে হবে না। গীতায় আছে—'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' সেই পরমপুরুষকে লাভ কর, তবেই জনম-মরণ-প্রহেলিকা চিরতরে ঘুচে যাবে, মা, পরম গতি লাভ করতে পারবে। তাঁকে পেলেই সব বাসনা-কামনার নিবৃত্তি হয়; মানুষ পূর্ণ হয়ে যায়, আত্মস্বরূপ হয়ে যায়।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'

স্ত্রী-ভক্ত—কি করে তাঁকে লাভ করতে পারব?

মহাপুরুষজী—মা, ঠাকুর বলতেন যে, তিন টান এক হলে ভগবানের দর্শন হয়—সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই তিন টান যদি এক করে ভগবানকে ডাকা যায় তা হলেই তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁর নাম কর, তাঁকে ধ্যান কর, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর—'প্রভু, দেখা দাও,

দেখা দাও।' কাঁদ, কাঁদ, খুব কাঁদ। তবেই তিনি কৃপা করে দেখা দেবেন। তিনি যে বড় আশ্রিতবৎসল, যাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাকে কখনো ত্যাগ করেন না।

বেলুড় মঠ

২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬—শনিবার, ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৯

সকালবেলা। মঠের জনৈক সন্ন্যাসী এ প্রচণ্ড শীতে কাশ্মীর গিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলিলেন ঃ পে—এই শীতে কাশ্মীর গিয়েছে! হৃষীকেশ থেকে নাকি হেঁটে গেছে। এ খবরটা শুনে অবধি মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। আহা! ঠাকুর, রক্ষা কর, তোমারই আশ্রিত। আমার মনে হচ্ছে যে, ওর মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে, নইলে এমন বুদ্ধি হবে কেন? এ সময় কি কেউ কাশ্মীর যায়? (খানিক চুপ করে থেকে) বাবা! এ বড় কঠিন পথ। এ ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাপার বড় শক্ত। সব মাথা এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস ধারণাই করতে পারে না। জাগতিক বিদ্যা শেখা সোজা; বড় দার্শনিক হওয়া, কি বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া, বড় কবি, কি চিত্রকর, কি বড় রাজনীতিজ্ঞ হওয়া—এ বরং সোজা; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা মহা কঠিন ব্যাপার। তাই তো উপনিষদ্‌কার বলেছেন—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।[১] এ পথ যে কত দুর্গম তা যারা এ মার্গে আসেনি, তারা ধারণাই করতে পারে না। উপনিষদে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে—যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়—পরা বিদ্যা বলা হয়েছে; আর যাবতীয় জাগতিক বিদ্যাকে বলেছে অপরা বিদ্যা। এ পরা বিদ্যা লাভ করতে হলে অটুট ব্রহ্মচর্যের দরকার। কায়মনোবাক্যে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে শরীর ও মনে শুদ্ধ পবিত্র ভগবদ্ভাব, ব্রহ্মভাব ধারণা করবার মতো শক্তি জন্মায়, মস্তিষ্কে নতুন স্নায়ুর সৃষ্টি হয়, শরীরের ভেতরকার সব অণু পরমাণু পর্যন্ত বদলে যায়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই। ঠাকুর বলতেন যে, দইপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, পাছে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদের অত ভালবাসতেন। তারাই ভগবদ্‌ভাব ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারে। এ-সব অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। অবশ্য সর্বোপরি চাই ভগবৎকৃপা। মহামায়ার বিশেষ কৃপা না হলে এ-সব কিছুই হবার জো নেই। তিনি কৃপা করে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার খুলে দিলে তবেই জীব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারি হতে পারে, নচেৎ নয়। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে', সেই মহামায়াই প্রসন্ন হয়ে মানবগণকে মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। মস্তিষ্কের ভেতর কত কি সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে! তার একটু

১ জ্ঞানীরা বলেন যে, ক্ষুরের ধারাল ফলার উপর দিয়ে চলা যেমন সুকঠিন, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ তেমনি দুর্গম।

কিছু বিগড়ে গেলে হয়ে গেল। মা ঠাকরুন বলতেন—'ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে যাতে মাথাটা ঠিক থাকে।' মাথাটি বিগড়ে গেলেই ব্যস—সব হয়ে গেল। স্বামীজী বলেছিলেন—'Shoot me if my brain goes wrong'—আমার মাথা যদি বিগড়ে যায় তো আমায় গুলি করে মেরে ফেলো।

পে—যখন প্রথম মঠে আসে তখন ওর মাথার গড়ন দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে, ওর মাথা বিগড়ে যাবে—ও পাগল হয়ে যাবে। শুনেছিলাম যে, হৃষীকেশে নাকি কোন হঠযোগীর কাছে হঠযোগ শিখছিল। ও-সব, বাবা, ভাল নয়। তা ছাড়া ও বহুদিন যাবৎ খালি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মঠের সাধুদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেনি—যা খুশি তাই করে বেড়িয়েছে। এখন দেখ'তো মাথাটি বিগড়ে বসেছে। মহারাজও বলতেন যে, প্রথমাবস্থায় সাধুর পক্ষে একেবারে একা একা থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অন্তত দুজন একসঙ্গে থাকা ভাল। আর ঐ করে বুঝি তপস্যা হয়? খালি হৃষীকেশ, উত্তরকাশী আর পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেই তপস্যা হলো? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন—ঠাকুর, রক্ষা কর, তোমারই আশ্রয়ে এসেছে। তুমি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে? আহা! বেচারী বড় ভাল ছেলে ছিল।

জনৈক ব্রহ্মচারী—ভাগবতে উদ্ধব-গীতায় আছে যে, সাধকের সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। দেব, গ্রহাদি, ব্যাধি, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নানাভাবে এসে সাধনের ঘোরতর বিঘ্ন উৎপাদন করে।

মহাপুরুষজী—শ্রীভগবানের কৃপা হলে সব বিঘ্নই কেটে যায়; ঠাকুর হলেন কপালমোচন, তাঁর আশ্রয় নিলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ইত্যাদি সব বিঘ্ন অপসারিত হয়ে যায়। চণ্ডীতে আছে—

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।।

অর্থাৎ সেই মহামায়া প্রসন্না হলে অশেষ রোগের নাশ হয়ে যায়; আবার তিনি রুষ্টা হলে নষ্ট হয় সকল বাঞ্ছিত কামনা। তাঁর আশ্রিতগণের বিপদ থাকে না—তারা সকল প্রকার বিপন্মুক্ত হয়ে যায়। আর তাঁর আশ্রিত ও কৃপাপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ সর্বজীবের আশ্রয়স্থল হয়—তাহা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ হয়। আর আছে সৎসঙ্গ—তাতে মানুষ রক্ষা পায়। 'সতাং সঙ্গঃ'—মহতের সঙ্গ বিশেষ দরকার। হাজার হাজার লোক চেষ্টা করে, কিন্তু দু-এক জনের মাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। মহারাজকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিল—'ভক্তি কিসে হয়?' তাতে মহারাজ বারংবার বলেছিলেন—সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ। মহাপুরুষেরা ভগবানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সৎসঙ্গ চাই, বাবা, সৎসঙ্গ চাই। সমস্ত শাস্ত্রাদিতেই সৎসঙ্গের খুব প্রশংসা আছে।

ব্রহ্মচারী—রামায়ণে আছে 'ঋষীণামগ্নিকল্পানাং' ইত্যাদি।

মহাপুরুষজী—ঠিক বলেছ। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অগ্নিকল্প ঋষিদের আশীর্বাদ ও বর লাভ করে রাক্ষসকুল-ধ্বংসের উদ্যোগ করেছিলেন।

পরে 'সতাং সঙ্গঃ' বারবার বললেন। শেষটায় বললেন—তবে কি জানো? আর যাই হোক, মহামায়ার কৃপা না হলে কিছুই হবে না। তিনি প্রসন্না হয়ে মায়ার এলাকার বাইরে যেতে দিলেই রক্ষা। নইলে আর কোন উপায় নেই। কৃপা, কৃপা, কৃপা! আন্তরিক হলে তিনি কৃপা করেনও।

বেলুড় মঠ

২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬—রবিবার, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯

সকালবেলা। মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হইয়াছেন। সাধন-ভজন সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতেছে।

মহাপুরুষজী—ভগবানের নাম, তাঁর ভজন করতে করতে সংযম আপনা হতেই আসবে। তাঁর নামের এমনই শক্তি যে, তাতে অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় সবই সংযত হয়ে যায়। তবে খুব প্রেমের সঙ্গে নাম করতে হবে। কোন রকমে তাঁর উপর যদি ভালবাসা এসে গেল—ব্যস। তার আর কোন ভাবনা নেই—খুব শীঘ্র শীঘ্র তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তাঁর উপর আপনার বোধ এসে গেলেই নিশ্চিন্তি! কিন্তু যতদিন মন নিম্নভূমিতে থাকে, ততদিন ভগবানের উপর ঠিক ঠিক ভালবাসা আসা সম্ভব নয়। খুব ভজন-সাধন, তাঁর নাম করতে করতে—যখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন এবং মন ক্রমে নিচের তিন ভূমি ছাড়িয়ে চতুর্থ ভূমিতে অবস্থান করে, তখনই সাধকের ঈশ্বরীয় রূপাদি দর্শন হয় এবং ক্রমে তাঁর উপর ভালবাসা জন্মে। মন শুদ্ধ না হলে সেই 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ভগবানে প্রেম কি করে হবে! সেইজন্য চাই খুব ভজন-সাধন, ব্যাকুলতা। তোমাদের হবে, খুব শীঘ্র শীঘ্রই হবে; কারণ তোমরা সব আকুমার ব্রহ্মচারী, কাম-কাঞ্চনের দাগটি পর্যন্ত মনে লাগেনি, অতি পবিত্র আধার। শুদ্ধ আধারে তাঁর প্রকাশ শীঘ্র শীঘ্র হয়। একটু জোর করে খেটেই দেখ না, হয় কি না। সাধন-ভজনকেই মুখ্য জিনিস জ্ঞান করবে; বাকি যত কাজকর্ম—বক্তৃতা, ক্লাস এ-সব জানবে গৌণ।

একই স্থানে, একই আসনে বসে জপধ্যান করা ভাল; তাতে একটা atmosphere (পরিবেশ)-এর সৃষ্টি হয়ে যায় এবং শীঘ্র মন স্থির হবার সাহায্য করে। আর মাতৃজাতি দেখলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে মনে প্রণাম করবে। আমাদের প্রতি ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষাই ছিল তাই এবং তিনি নিজের জীবনেও করে গেছেন। সন্ন্যাসীর জীবন যেন নির্জলা একাদশী।

একটুও মালিন্য থাকবে না—নিষ্কলঙ্ক জীবন হওয়া চাই। মনে কাম-কাঞ্চনের এতটুকু রেখাপাতও হতে দেবে না। সর্বক্ষণ উচ্চ চিন্তা, ভগবদ্ধ্যান, ভজন, পাঠ, প্রার্থনা—এই-সব নিয়ে থাকতে হবে। তোমাদের হলো আধ্যাত্মিক জীবন, দিব্য জীবন। ঠাকুর বলতেন—'মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে।' প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন মৌমাছির মতো হবে। ভগবদানন্দই সে সম্ভোগ করবে, অন্য কোন দিকে মনকে যেতে দেবে না। তোমরা যুগাবতারের লীলাপুষ্টির জন্য তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েছ। সমগ্র পৃথিবী চেয়ে আছে তৃষিত নয়নে তোমাদের দিকে ঠাকুরের ভাব পাবার জন্য। আমাদের পার্থিব জীবন তো শেষ হয়ে এলো। এখন সে-স্থান পূরণ করতে হবে তোমাদের। কত বড় দায়িত্ব তোমাদের উপর—একবার ভেবে দেখ তো? সব শক্তির আধার তো তিনি। যেমন যেমন প্রয়োজন হবে, তোমাদের ভেতর তিনি শক্তিসঞ্চার করে দেবেন—তোমাদেরও তাঁর বাণী, তাঁর ভাব প্রচার করবার অধিকারি করবেন। যত তাঁকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ততই বুঝতে পারবে যে, তিনি অন্তরে বসে সূক্ষ্মভাবে তোমাদের হাত ধরে রয়েছেন। তিনি যে ভগবান আর তোমরা যে তাঁরই আশ্রিত। তিনি জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা—সব দেবেন, জীবন মধুময় করে দেবেন।

পরে ঠাকুরের অবতারত্ব ও জীবের দুঃখমোচনের জন্য দেহধারণ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ, অবতারপুরুষদের পূর্ণজ্ঞান বরাবর থাকে কি?

মহাপুরুষজী—তা থাকে বই কি? এই দেখ না শ্রীকৃষ্ণের জীবনে—জন্ম থেকেই তিনি যে ভগবান সে-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সব অবতারে ঐসকল ভাবের অভিব্যক্তি একরকম হয় না। কিন্তু তাঁদের সেই বিষয়ে জ্ঞান পুরাপুরি থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণ করবার জন্যই তো ভগবানের শক্তির আবির্ভাব—ওঁদের সবটাই দয়ার ব্যাপার। অবতার তো আর সাধারণ জীবের ন্যায় কর্মবশে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁদের আবার অজ্ঞান কোথায়? পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, মায়াধীশ; মায়াকে আশ্রয় করে জগতে অবতীর্ণ হন এবং যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করে আবার স্ব-স্বরূপে লীন হয়ে যান। তাঁদের সাধন-ভজন, কঠোর তপশ্চরণ—এ-সবই লোকশিক্ষার জন্য, জগতের সামনে আদর্শ দেখাবার জন্য। তিনি তো ঈশ্বর, তিনি তো পূর্ণ; তাঁর আবার অপূর্ণত্ব কোথায়? গীতাতে ভগবান বলেছেন—

> ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।। ৩।২২

—তাঁর কিছুই অপ্রাপ্ত নেই, কারণ তিনি পূর্ণ; তবু লোকশিক্ষার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। আবার বলেছেন—

> ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
> ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।। ৪।১৪

—তাঁর কর্মফলে কোন স্পৃহা নেই আর তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না। এ না হলে তাঁর ঈশ্বরত্ব—অবতারত্ব কোথায়? অবতারেরা যতদিন নরদেহে জগতে অবস্থান করেন, ততদিন তাঁদের সব ব্যবহারাদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মতোই মনে হয়—সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। এ সব দেখে মনে হয় যে, তাঁদের পূর্ণজ্ঞান সব সময়ে থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়।

বিশেষ করে ঠাকুরের জীবনে দেখা যায় যে, ঐশ্বর্যের বিকাশ আদৌ নেই—মানবভাবই তাঁর জীবনে বেশি ব্যক্ত হয়েছিল। এবার শুদ্ধসত্ত্বভাবের অবতার। তাই তো তিনি বলেছিলেন—'এ যেন রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন।' ঠাকুরের এ ভাব বোঝা বড় কঠিন। দেখনা কেশববাবুর দেহত্যাগ হলে ঠাকুর খুবই কাঁদতে লাগলেন। আর বলেছিলেন—'কেশব দেহত্যাগ করেছে; আমার মনে হচ্ছে যে, একটা অঙ্গ খসে গেছে। এখন কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?' ইত্যাদি। যেমন মানুষ আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে শোক করে, কাঁদে—ঠিক তেমনি। এই তো হলো তাঁদের লীলা, এ ধারণা করা বড় শক্ত ব্যাপার। অধ্যাত্ম-রামায়ণে এ বিষয়ে বেশ চমৎকার কথা আছে, কেমন সুন্দর জ্ঞানভক্তির সামঞ্জস্য তাতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র স্বয়ং পরব্রহ্ম—ত্রিকালজ্ঞ। রাবণের সঙ্গে সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস করে পুনরায় ধর্মসংস্থাপন করার জন্যই তিনি নরদেহ ধারণ করেছিলেন। রাবণ সীতাহরণ করবে তাও তিনি জানতেন। অধ্যাত্মরামায়ণেই রয়েছে যে, রাবণ ভিক্ষুকবেশে সীতাহরণ করতে আসার পূর্বেই রামচন্দ্র সীতাকে বলছেন—'হে জানকি! রাবণ ভিক্ষুকরূপে তোমাকে হরণ করতে আসবে, তুমি তোমার ছায়ামূর্তি কুটিরে স্থাপন করে অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং তথায় অদৃশ্যরূপে এক বৎসরকাল অবস্থান কর। রাবণবধের পর পুনরায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে।' এই বলে সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করালেন। আবার ওদিকে সীতাহরণের পর কত শোক করছেন! আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে দিনরাত কাঁদছেন আর সীতার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন! বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী সকলকে বিলাপ করতে করতে জিজ্ঞাসা করছেন সীতার খবর! শোকে 'হায় হায়' করে সারা বন-জঙ্গল পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন! এ-সব অতি মজার ব্যাপার! তাঁরা সহজে ধরা দিতে চান না।

বেলুড় মঠ

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬—সোমবার, ৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯

স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রণামানন্তর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ হাসিতে হাসিতে পার্শ্বস্থ সেবককে দেখাইয়া বলিলেন—শরীর কেমন আছে, তা এদের জিজ্ঞাসা কর। আমি অত ভাবিনে। শরীর যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না—মাইরি বলছি। এই সকলে জিজ্ঞাসা করে, তাই তখন যা মনে আসে বলে দি। আমি জানি যে, আমার দেহ, মন, প্রাণ সবই তাঁর চরণে অর্পণ করে দিয়েছি—সবই তাঁর। এখন তিনি যেমন ইচ্ছা হয় করবেন, এ শরীর আরো রাখার প্রয়োজন বোধ করেন তো রাখবেন। নইলে যখনই ডাকবেন চলে যাব। আমি তো তাঁর আহ্বানের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছি। তা বলে এ শরীরের কোন অযত্ন করিনে। তোমরা সকলে যেমন বল, ডাক্তার যেমন বলে, সেইভাবেই চালাবার চেষ্টা করি। এ শরীরের জন্য (সেবকের দিকে তাকিয়ে) এদেরই বা কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা করি কেন জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মতো নয়? এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবদ্‌-উপলব্ধি হয়েছে, এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরকে তিনি তাঁর যুগধর্মপ্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন। তাই এত। নইলে খালি শরীরটা রক্তমাংসের খাঁচা বই তো নয়? তবে ঠাকুর আমায় তাঁর সেবাদি বড় একটা করতে দিতেন না। তাতে অনেক সময় আমার মনে কষ্ট হতো। তিনি যে কেন অমন করতেন তা পরে একদিনকার ঘটনায় বুঝতে পারলাম। তাঁর ভাব কে বুঝবে? একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে রয়েছি, আরো অনেক ভক্তও আছেন। তাঁর ঘরে বসে অনেক কথাবার্তা বলার পর তিনি ঝাউতলার দিকে শৌচাদিতে গেলেন। সাধারণত তাঁকে শৌচে যেতে দেখলে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেউ একজন তাঁর গাড়ুটা নিয়ে যেত এবং শৌচাদির পরে তাঁর হাতে গাড়ু থেকে জল ঢেলে দিত। তিনি অনেক সময়ই ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করতে পারতেন না। যাই হোক, সেদিন তাঁকে শৌচে যেতে দেখে আমিই গাড়ুটা নিয়ে ঝাউতলার দিকে গেলাম। তিনি শৌচাদি সেরে আমাকে গাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—'দেখ, তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মতো দেখি।' তাঁর কথা শুনে আমি তো অবাক! তখন বুঝলাম যে, তিনি কেন তাঁর সব রকম সেবা আমায় করতে দিতেন না। অনন্তভাবময় ঠাকুর—তাঁর ভাব আমরা কি বুঝব? তিনি দয়া করে যতটুকু বোঝান, ততটুকুই মানুষ বুঝতে পারে।

পরে দীক্ষাদির কথা উঠিল। তাহাতে মহাপুরুষজী বলিলেন—না, দীক্ষা দিতে আমার কোনই কষ্ট হয় না, বরং আনন্দ হয়। ভক্তেরা আসে, তাদের ঠাকুরের নাম দিয়ে দিই, তাদের সঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গ করি। আমার দীক্ষা দিতে কোন ভট্‌চার্জিগিরি নেই। অত

তন্ত্রমন্ত্র কিছু আমি জানিনে, আর জানবার কোন প্রয়োজনও নেই। ঠাকুরকে জানি—তিনিই সব। তাঁরই নাম, তাঁরই শক্তি—তাঁর ইচ্ছাতে তাঁরই নাম সকলকে দিই; আর প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, তুমি এদের গ্রহণ কর, এদের ভক্তি বিশ্বাস দাও, দয়া কর।' তা তিনি সকলের হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস দেন। আমার ঠাকুরই সব।

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।'[১]

যে যেমন প্রার্থনা করে, তাকে তিনি তেমনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলই দিয়ে থাকেন। এইটুকু ঠাকুরের মাহাত্ম্য যে, তাঁর নাম নিয়ে শান্তি, তাঁর সেবা করে শান্তি, তাঁর চিন্তা করে শান্তি। তিনি যুগাবতার, এই জন্যই এ-সব হয়—এ-সব হবেই। আর এমনি তাঁর আকর্ষণী শক্তি যে, আপনা হতেই লোক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবে—তা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন।

বেলুড় মঠ

৩ পৌষ, ১৩৩৬ বুধবার—১৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯

দক্ষিণভারত ও সিংহলের কথায় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—হাঁ, সিলোন গিয়াছিলাম বই কি! স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে এসে কয়েক মাস পরে আমাকে সেখানে বেদান্তপ্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন। আমি ৭।৮ মাস কলম্বোতে ছিলাম—এক ছত্রে থাকতাম। নিয়মিতভাবে গীতাক্লাস ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করতাম; অনেক লোক আসত। বেশ ছিলাম। ওখানকার প্রসিদ্ধ মন্দিরাদিও সব ঘুরে দেখেছি। বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির—ওখানে নাকি বুদ্ধদেবের একটি দাঁত রাখা আছে। কি বিরাট কাণ্ডই না করেছে! মন্দির দেখলে তাক লেগে যায়। স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে মাদ্রাজে এলেন, আমি তার আগে থেকেই মাদ্রাজে গিয়েছিলাম স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। আমি অবশ্য তার পূর্বেও একবার রামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করতে ও-অঞ্চলে গিয়েছিলাম এবং দক্ষিণভারতের প্রায় সব প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানাদি দর্শন করেছিলাম। ঐ-সব বিরাট মন্দিরাদি দেখে বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবাসীরা কতটা ধর্মপ্রাণ। ভগবানকে নিয়েই যত কিছু লীলাখেলা—তাঁকেই নানাভাবে সম্ভোগ করার চেষ্টা। ভগবদ্‌ভক্তেরা বহুভাবে ভগবানকে সেবা করতে চান; তাতেই তাঁদের আনন্দ ও তৃপ্তি।

জনৈক সন্ন্যাসী—সিলোন আপনার কেমন লেগেছিল, মহারাজ?

---

১ হে দেবদেব, তুমি আমার মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা, তুমি বিদ্যা, তুমি ঐশ্বর্য, তুমিই আমার সব।

মহাপুরুষজী—আমার সব জায়গাই ভাল লাগে। কখনো কোন স্থানে অতৃপ্তি বোধ করিনি। যখন যেখানে থাকি, বেশ আনন্দেই থাকি। ভগবানকে নিয়ে থাকলেই সব জায়গায়ই আনন্দ। হাঁ, সিলোন ও দক্ষিণভারত বেশ ভালই লেগেছিল।

সন্ন্যাসী—মহারাজ, ছেলেবেলায় আপনার নাম যে তারকনাথ রাখা হয়েছিল, তার কোন বিশেষ কারণ ছিল কি?

মহাপুরুষজী—হাঁ, শুনেছি অনেক দিন ছেলেপিলে না হওয়ায় বাবা ও মা তারকেশ্বরের মানত করেছিলেন এবং একটি ছেলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। বাবা তারকনাথ মাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর একটি সুপুত্র জন্মাবে। তারপরেই আমার জন্ম হয়েছিল বলে আমার নাম তারকনাথ রাখা হয়। গর্ভধারিণী মা—তাঁর নাম ছিল বামাসুন্দরী—খুবই ধর্মপ্রাণা ও লক্ষ্মী ছিলেন; দেখতেও বেশ সুন্দরী ছিলেন। ছেলেবেলায় ধর্মভাব তাঁর কাছেই পেয়েছি। বাবাও খুব ধার্মিক ছিলেন। তাঁর আয়ও ছিল যথেষ্ট। পঁচিশ-ত্রিশটি গরিব ছেলেকে বাবা নিজের বাড়িতে রেখে খাওয়াপরা দিতেন। বারাসাত স্কুলে তারা সব পড়ত। আমিও তাদের সঙ্গেই থাকতাম। মা নিজের হাতে সকলকে রান্না করে খাওয়াতেন। বাবা রাঁধবার বামুন রাখতে চাইলে মা রাখতে দিতেন না। তিনি বলতেন, 'এ তো আমার মহাভাগ্য যে, এতগুলি ছেলেকে রান্নাদি করে খাওয়াচ্ছি।' আমি মার কাছে আদর-স্নেহ বড় একটা পাইনি। তিনি কাজকর্ম নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। সেই পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলের মধ্যে আমিও একজন। আমার জন্য আলাদা খাবার কিছু করতেন না; সকলের সঙ্গেই খেতাম। কেউ কেউ বলত—'ছেলেটিকে একটু আদর-যত্ন কচ্ছে না।' তাতে মা বলতেন—'তাঁর ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন—তিনিই ওকে দেখবেন।' আমার বয়স যখন নয় বৎসর আন্দাজ, তখন মা মারা যান। মার সম্বন্ধে তেমন কিছুই মনে নেই। বাবা কানাই ঘোষাল খুব ধার্মিক ও গুণী, আর খুব ভক্ত ছিলেন। 'মা, একি করলি, আমায় এখনো কৃপা করলিনি'—এই-সব বলে রাত্রিতে ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন।

মা-ই লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার আয় কমে যেতে লাগল। তাঁর অনেক দান-ধ্যান ছিল। কিন্তু আয় কমে যেতে আর আগের মতো দানাদি করতে পারতেন না। আমি খুবই ভাগ্যবান যে, অমন বাপ-মায়ের ঘরে জন্মেছিলাম। বাপ-মা ভাল হলে ছেলেপিলে ভাল হয়। বাবার ত্যাগ যথেষ্ট ছিল। অত টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু নিজে থাকবার জন্য একটা ভাল বাড়িও করেননি। সব টাকা গরিব-দুঃখীদের সেবায় ব্যয় করে গিয়েছেন। বাবা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁর কাছে কামাখ্যা থেকে একজন সাধক ভট্টাচার্য মশাই এসেছিলেন। তাঁর কী চেহারা! বেঁটে, লাল টুকটুকে। সারারাত দুজনে খুব পূজাদি করতেন। বাড়িতেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। একবার পুজোর সময় ঘট স্থাপন করে তাতে ডাব নারকেল দেওয়া হয়েছিল। সেই ডাব থেকেই নারকেল গাছ হয়ে গিয়েছিল—অনেকটা উঁচু।

বেলুড় মঠ
১০ পৌষ, ১৩৩৬, বুধবার—২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯

পূর্ব রাত্রে মঠে 'খ্রীস্টমাস ঈভ' উৎসব খুব আনন্দ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিচের বৈঠকখানা ঘরে 'মেরীর কোলে যীশু' এই ছবিখানি পত্র, পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন ও কেক প্রভৃতি ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী ছাড়া অনেক ভক্তও যোগদান করিয়াছিলেন ঐ উৎসবে। বাইবেল হইতে যীশুর জন্ম ও উপদেশাদি পাঠান্তে কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসী যীশুর পবিত্র জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজে নিচে গিয়া ঐ উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু উৎসবের সব খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়াছিলেন এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সকালবেলা মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হইতেই তিনি সকলকে হাসিমুখে 'Happy Christmas' (শুভ খ্রীস্টজন্ম-বাসর) বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব রাত্রির 'খ্রীস্টমাস ঈভ' উৎসব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—এ উৎসব আমাদের হয়ে আসছে সেই বরাহনগর মঠ থেকেই। ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে বাবুরাম মহারাজের মা তাঁদের দেশ আঁটপুরে কিছুদিনের জন্য যেতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। স্বামীজী সকলকে নিয়ে আঁটপুরে গেলেন। তখন আমাদের সকলেরই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য; ঠাকুরের বিরহে সকলেরই মন-প্রাণ ছটফট করছে। সকলেই কঠোর সাধন-ভজনে রত। দিনরাত সর্বক্ষণ কি করে ভগবানলাভ হবে, কি করে প্রাণে শান্তি হবে, সেই ছিল একমাত্র চিন্তা। আঁটপুরে গিয়ে আমরা খুব ভজন-সাধন চালিয়েছিলাম। ধুনি জ্বেলে সারারাত ধুনির পাশে বসে জপ-ধ্যানে কাটিয়ে দিতাম। স্বামীজী আমাদের নিয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রসঙ্গাদি খুব করতেন। কখনো উপনিষদ্, কখনো গীতা, ভাগবত এ-সব পড়াতেন ও আলোচনাদি করতেন। এভাবে কিছুদিন কাটল। এক রাত্রে আমরা সকলেই ধুনির পাশে বসে ধ্যান করছি, অনেকক্ষণ ধ্যান করার পর হঠাৎ স্বামীজী যেন ভাবাবিষ্ট হয়ে যীশুখ্রীস্টের জীবন সম্বন্ধে তদ্গতচিত্তে বলতে আরম্ভ করলেন। যীশুর কঠোর সাধনা, জ্বলন্ত ত্যাগবৈরাগ্য, তাঁর উপদেশ—সর্বোপরি ভগবানের সঙ্গে তাঁর একত্বানুভূতি ইত্যাদি ঘটনা এমন তেজের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন যে, আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তখন মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং যীশুই স্বামীজীর মুখ দিয়ে তাঁর অলৌকিক জীবন-কাহিনী আমাদের শোনাচ্ছেন। এই-সব শুনতে শুনতে আমাদের প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল; আর কেবলই মনে হচ্ছিল যে, যেমন করেই হোক আগে ভগবান লাভ করতে হবে, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে

হবে—আর সবই বাজে। স্বামীজী যখন যে বিষয়ে বলতেন, একেবারে চূড়ান্ত করে বলতেন। পরে জানা গেল যে, ঐদিনই ছিল 'খ্রীস্টমাস ঈভ', অথচ আগে কেউই তা জানত না। আমাদের মনে হলো যে, যীশুই যেন স্বামীজীর ভেতর আবির্ভূত হয়ে আমাদের ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব এবং ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র করবার জন্য তাঁর সেই মহিমময় জীবনী ও উপদেশ আমাদের শুনিয়েছিলেন।

আঁটপুরে থাকাকালে আমাদের সকলের ভেতর সন্ন্যাসী হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকার সংকল্প দৃঢ় হলো। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে গিয়েছিলেনই; সেই ভাব আরো পাকা হলো আঁটপুরে। যীশু ছিলেন সন্ন্যাসীর রাজা, ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি। আদর্শ সন্ন্যাসী না হলে তাঁর অত্যাশ্চর্য লোকাতীত জীবন ও অপরূপ উপদেশ বোঝা বড় কঠিন। আমরা ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গলাভ করেছি; তাই তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁকে কি করে বুঝবে? এমনকি যীশুকে যারা পুজো করে, সেই খ্রীস্টানরাও তাঁকে যথার্থরূপে বুঝতে পারেনি—বিশেষ করে ইদানীন্তন খ্রীস্টান পাদ্রীরা তো তাঁকে আদৌ বুঝতে পারে না, তাঁর জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কোথায় তা ধরতেই পারে না। কারণ আজকালকার খ্রীস্টধর্মপ্রচারকদের অনেকের মধ্যেই সেই ত্যাগ-তপস্যা, বিবেক-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্বের অভাব হয়ে পড়েছে।

ভারতবাসীরা ধর্ম কি জিনিস তা বোঝে এবং কি করে ধর্মজীবন যাপন করতে হয় তাও জানে। সেই জন্যই দেখ না ভারতবর্ষে এই গত দেড় শত বৎসর খ্রীস্টধর্মপ্রচারের ফল কি হয়েছে? কিছুই নয়। কটা লোক তাদের প্রচারের ফলে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ করেছে?

ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা—এ-সবই হলো ধর্মজীবনের ভিত্তি। স্বয়ং যীশুই বলেছেন—"Blessed are the pure in heart, for they shall see God"—পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কেন না তারা ভগবানকে দর্শন করতে পারবে। এই seeing God-ই—ভগবানকে দর্শন করাই হলো, ধর্মজীবনের লক্ষ্য। তা না হয়ে খালি বড় রকমের একটা সঙ্ঘ করা হলো, দলের কোটি কোটি লোকের নামে খাতা ভরতি হয়ে গেল—তাতে ধর্মজগতে বড় কাজ হয় না। রাজনৈতিক ব্যাপারে এ-সবের মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মরাজ্যে নয়। স্বামীজী বলেছিলেন—এমন কি দশ জন লোককেও যদি প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করাতে পারি তবে মনে করব যে, আমার কাজ করা সার্থক হয়েছে। তাঁর এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, ধর্মজীবন লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার। ভগবান-লাভ বা ব্রহ্মানুভূতিই হলো ধর্মজীবন। 'Religion is realization'—প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম। খ্রীস্টান পাদ্রীদের মধ্যে খুব বড় বড় মেধাবী লোক আছে; খুব পড়াশুনা করেছে—খুব পাণ্ডিত্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি যীশুর উপদিষ্ট ত্যাগ-তপস্যাও থাকত, তবে তো হতো!

তোমরা ঠাকুরের এই পবিত্র সঙ্ঘে এসেছ, ত্যাগীশ্বর ঠাকুরকে তোমাদের জীবনের আদর্শ করেছ এবং সে-আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করছ; তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা সেই ব্রহ্মানন্দের অধিকারি হবে—তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

এ সঙ্ঘ যতদিন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যাদি দ্বারা একমাত্র ভগবানলাভ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য-জ্ঞানে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সর্বভাবময় ঠাকুরের জীবনকে আদর্শ করে চলবে, ততদিন এ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তি অব্যাহত থাকবে নিশ্চয়। কাজকর্ম, প্রতিষ্ঠা এ-সব বাড়ানো তো অতি সহজ কথা। কিন্তু একমাত্র ভগবানলাভ করবার জন্যে তপোনিষ্ঠ হয়ে সমগ্র জীবন একভাবে কাটিয়ে দেওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। স্বামীজী বলেছেন, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হবে আমাদের motto (অনুসরণীয় বাণী)। আগে আত্মজ্ঞানলাভ, তারপরে জগতের হিত। ঠাকুরও নিজ জীবনে তাই করে দেখিয়েছেন এবং স্বামীজী প্রভৃতি সব অন্তরঙ্গ শিষ্যদেরও তাই উপদেশ করেছেন। স্বামীজী এ সঙ্ঘে সেবাদি যে-সকল কাজের প্রবর্তন করে গেছেন, সে-সব কাজ দৈনন্দিন সাধন-ভজনের সঙ্গে করতে হবে ভজন-সাধনের অঙ্গজ্ঞানে, তবেই কাজও ঠিক ঠিক হবে। তা না করে যদি কেউ খালি কর্ম-স্রোতে গা ঢেলে দেয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত টাল সামলানো বড় মুশকিল। অনেক সময় কাজের খুব সাফল্য দেখে তাতে ঝোঁক বেড়ে যায়। তা কিন্তু ভাল নয়; ওতে শেষ পর্যন্ত জীবনের উদ্দেশ্য ভুল হয়ে যায় এবং সব গুলিয়ে দেয়। ঠাকুরের কাছে আমরা ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ কখনো শুনিনি। তাঁর ঐ একমাত্র কথা, একমাত্র উপদেশ—'যো সো করে আগে ভগবানলাভ করে নে।'

জনৈক সন্ন্যাসী—মহারাজ, ঠাকুর তো সিদ্ধাইকে আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় বলে গেছেন; কিন্তু যীশুর জীবনীতে তো দেখতে পাওয়া যায় অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করেছেন, রোগ আরাম করেছেন এবং আরো নানা রকম অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়েছেন; তাঁর বারো জন শিষ্যের ভেতর শক্তিসঞ্চার করে তাঁদেরও ঐ-সকল করতে অনুজ্ঞা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

মহাপুরুষজী—হাঁ, ঠাকুর তো ঠিকই বলেছেন যে, সাধকগণ সিদ্ধাইলাভের দিকে মন দিলে আর ভগবানের দিকে এগুতে পারে না—তাদের ওখানেই হয়ে গেল। মা-কালী ঠাকুরকে দেখিয়েও ছিলেন যে, সিদ্ধাই বিষ্ঠার ন্যায় হেয়। কিন্তু যীশুর জীবনে যে-সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, সে-সব তিনি আদৌ সিদ্ধাই দেখাবার জন্য করেননি—জীবদুঃখে কাতর হয়ে জীবের দুঃখমোচন করেছেন মাত্র। বাইবেলেই আছে যে, তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষু দান করে বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে স্পর্শমাত্রে রোগমুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন—এ-সব কথা প্রকাশ করো না। প্রতিষ্ঠা বা লোকমান্য লাভ করার জন্য তিনি কখনো ও-সব করেননি। শাস্ত্রেও আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা আত্মজ্ঞানলাভের পর একমাত্র দয়াবৃত্তি অবলম্বন করে জগতে অবস্থান করেন। তাঁদের

আর কোন কামনা-বাসনা থাকে না। তাছাড়া যীশু তো আর সাধারণ সাধক ছিলেন না। তিনি অবতার। জগৎপিতা পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর সত্তা এক হয়ে গিয়েছিল। অতএব তাঁর পক্ষে এ-সব করা কিছুই অস্বাভাবিক বা দূষণীয় নয়। সাধারণ লোক যে-সকল কাজকে অতি আশ্চর্য ও অসম্ভব ব্যাপার মনে করে, সে-সব অবতারপুরুষদের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ কাজ। সাধ্য-সাধনা করে ও-সব করতে হয় না। তাঁদের সামান্য ইচ্ছামাত্রেই অঘটন ঘটে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নাস্তিকদের মনে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যও যীশু ঐরকম অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের কাজের গূঢ় রহস্য অনেক সময় বোঝা কঠিন।

স্পর্শমাত্র শারীরিক ব্যাধি দূর করা—এ আর কি বেশি অলৌকিক? এ-সব তো সহজ ব্যাপার। ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন—স্পর্শমাত্র মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন! জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি একমুহূর্তে ক্ষীণ করে দিয়ে মানুষের সমগ্র মনের গতি ভগবন্মুখী করে দেওয়া—এ হলো সব চেয়ে বড় সিদ্ধাই। অমনটি আর কোন অবতারপুরুষ করতে পারেননি। উঃ! কী কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি! সে-সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, মনের আড়বাঁক সব ইচ্ছামাত্র সোজা করে দিতেন। তাঁর স্পর্শমাত্রে মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাইরে থেকে দেখতে তো সাধারণ মানুষের মতো; কিন্তু তাঁর দেহ আশ্রয় করে লীলা করতেন সর্বশক্তিমান ভগবান।

একজন জার্মান মহিলাভক্ত মহাপুরুষজীকে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই মহাপুরুষজী স্মিতমুখে তাঁহাকে বড়দিনের অভিনন্দন জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল খ্রীস্টমাস ঈভ কেমন লাগল?

মহিলাভক্ত—ও! আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। খ্রীস্টমাসে এমন আনন্দ জীবনে কখনো পাইনি। আমাদের পাশ্চাত্যদেশে খ্রীস্টমাসে আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, সাজগোজ, নাচগান এ-সবেরই আয়োজন বেশি এবং সারা দেশ ঐতেই খুব মেতে যায়। পুজোপাঠ যা হয়, সে-সব অনেকটা যেন নিয়মবাঁধা নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে। তাতে আন্তরিকতার অভাব খুবই। আমোদ-আহ্লাদেই ব্যয় হয় কোটি কোটি টাকা। ও-সব বাহ্যিক আড়ম্বরে প্রাণের তৃপ্তি হয় না। তাই গত বৎসর খ্রীস্টমাসের রাত্রে প্রায় ১ টার সময় যীশুর কাছে খুব কাতর-প্রাণে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম, 'প্রভু, দয়া করে আমার জীবনে অন্তত একটি বারও ঠিক ঠিক খ্রীস্টমাসের আনন্দ উপলব্ধি করিয়ে দাও।' তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। এবার এখানে ঠিক ঠিক খ্রীস্টমাসের আনন্দ পেলাম। আমার প্রাণ ভরপুর হয়ে গিয়েছে।

মহাপুরুষজী—আমাদের হলো ভক্তির পুজো। এখানকার খ্রীস্টমাস উৎসব সাত্ত্বিক উৎসব। প্রেম, ভক্তি-বিশ্বাস, আন্তরিক প্রার্থনা—এই হলো এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই-ই প্রকৃত খ্রীস্টমাস।

মহিলাভক্ত—প্রভু কি বাস্তবিক ইহুদী ছিলেন?

মহাপুরুষজী—তিনি ইহুদীও ছিলেন না, জেণ্টাইলও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ-সবের বহু ঊর্ধ্ব স্তরের—ভগবানের শক্তির অবতার, জীবকে ত্রাণ করবার জন্য নরদেহে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বেলুড় মঠ

১৯ মাঘ, রবিবার, ১৩৩৬—২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০

অপরাহ্ন। আজ রবিবার বলিয়া মঠে খুব ভক্ত-সমাগম হইয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরও লোকে পরিপূর্ণ। তিনিও আনন্দে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। জনৈক ভদ্রলোক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছেন, মহারাজ?

মহারাজ—বেশ আছি।

ভক্ত—(কাতরভাবে) কিন্তু আপনার শরীর দেখে তা তো মনে হয় না। শরীর তো খুবই খারাপ দেখাচ্ছে।

মহারাজ—ও! তুমি শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছ? তা শরীর মোটেই ভাল নেই। আমি কিন্তু বেশ আছি। এই পাঁচ জনের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, ভগবানের নাম হচ্ছে, এ-সব নিয়ে বেশ আনন্দে আছি। 'জব্ তক্ রাম নাম লেতী হ্যায়, তব্ তক্ জানকী আচ্ছী হ্যায়।'—যতক্ষণ পর্যন্ত সীতা রাম-নাম উচ্চারণ করতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ভালই আছেন। যতক্ষণ মুখে রাম-নাম উচ্চারণ করতে পারা যায়, ততক্ষণ ভালই আছি বলতে হবে। দেহধারণের উদ্দেশ্যই হলো ভগবানের নাম করা। তা করতে পারলেই হলো। হরি মহারাজ একটা কথা বলতেন, 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।' ভারী সুন্দর কথা! দুঃখ-কষ্ট তো দেহের। আর দেহের ভিতর যিনি আছেন তাঁর দুঃখ-কষ্ট কিছুই নেই। তিনি আনন্দস্বরূপ। প্রত্যেক দেহের ভেতরই তিনি রয়েছেন। প্রত্যেকের স্বরূপই হলো তাই। সেই স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হবে। তাঁকে না জানাতেই তো এত গোলমাল।

ভক্ত—আমরা তো এত বুঝতে পারিনে। আমরা আপনাকে দেখছি। আপনার শরীরটি ভাল থাকে—এই আমরা চাই।

মহারাজ—তোমরা তা চাইতে পার, কিন্তু আমি জানি যে আমি শরীর নই; আর

তোমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাও দেহের সম্বন্ধ নয় এবং দেহের নাশে সে সম্বন্ধ নষ্টও হবে না। বাবা, এ দেহ তো দু-দিনকার, কিন্তু আত্মা নিত্য এবং সে-আত্মার সম্বন্ধও নিত্য। যতই চেষ্টা কর না কেন, এ দেহ চিরদিন কিছুতেই থাকবে না। রামমোহন রায় ভারী সুন্দর বলেছিলেন—

'যত্নে তৃণ কাষ্ঠখণ্ড রহে যুগ-পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন?'

এ অজ্ঞান দূর করতে হবে। মানুষ অজ্ঞানবশত দেহটাকে 'আমি' মনে করেই তো যত কষ্ট পায়। এর পরিত্রাণের উপায় কি জান? উপায় একমাত্র তাঁকে জানা। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। সকলেরই অন্তরাত্মা তিনি। তাঁকে জানলে মানুষ দুঃখ-কষ্টের পারে চলে যায়। তাই তো গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন যে, তাঁকে একবার ঠিক ঠিক জানতে পারলে মহাদুঃখও জীবকে বিচলিত করতে পারে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে মানুষ সর্বাবস্থায় সুমেরুবৎ অচল অটল অবস্থায় থাকতে পারে।

ভক্ত—কি করে সে-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়? আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের সে-অবস্থা লাভ হয়।

এই প্রশ্ন শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজের মন যেন অন্য রাজ্যে চলিয়া গেল। তিনি খুব গম্ভীর অথচ শান্তভাবে বলিতে লাগিলেন—আমাদের তো, বাবা, আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা তো খুবই আশীর্বাদ করছি। তাঁর দিকে কেউ এগুচ্ছে দেখলে আমাদের প্রাণে যে কী আনন্দ হয়, তা কেমন করে বলে বুঝাব? যে তাঁর রাজ্যে এগুচ্ছে, যে তাঁকে আন্তরিক ভজনা করে, সে তো আমাদের পরমাত্মীয়, খুব আপনার জন। আমরা তো নিরন্তর ঐ এক প্রার্থনা করছি, যাতে লোকের কল্যাণ হয়, যাতে তারা শ্রীভগবানের দিকে এগুতে পারে। এ অনিত্য সংসারের মায়া কাটিয়ে যাতে লোক তাঁকে পেতে পারে—তাই তো আমাদের একমাত্র চেষ্টা। ঠাকুর বলতেন, 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তোরা পাল তুলে দে না।' শ্রীভগবানের কৃপা তো সর্বদাই আছে, কিন্তু সেই কৃপা পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা তো আশীর্বাদ করছিই, তোমরাও ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক। দেখবে তাঁর কত দয়া! তিনি কৃপা করবার জন্য সদাই হাত বাড়িয়ে আছেন। তাঁর নাম কর, তাঁর ভজন কর, সদা-সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন কর, খুব আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাক। দেখবে যে তাঁর কত কৃপা! এত কৃপা আসবে যে সামলাতে পারবে না, মানব-জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আবার তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবে না। তিনিই তো তাঁর মায়াদ্বারা জগৎকে মোহিত করে রেখেছেন। তাই সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়, 'হে প্রভু, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে রেখো না। তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। মানব-জীবন ধন্য হয়ে যাক।' তিনি যদি একটিবার মুখ তুলে না চান তো তাঁর এ মায়া

অতিক্রম করে কার সাধ্য! চণ্ডীতে আছে, 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' অর্থাৎ সেই তিনিই প্রার্থনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে মনুষ্যগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তখনই জীব মায়ামুক্ত হয়ে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁর দয়া ছাড়া এ মায়ার বন্ধন কাটা বড় কঠিন। তবে এও সত্য যে, কেউ যদি ব্যাকুল হয়ে আন্তরিক প্রার্থনা করে, তবে তিনি সে ডাক শোনেন এবং তাঁর মায়ার আবরণ সরিয়ে দেন। তোমরা সংসারে রয়েছ, তোমাদের প্রার্থনা তিনি আরো বেশি শুনবেন। সংসারীদের ওপর তাঁর বিশেষ কৃপা। তিনি তো জানেন তোমাদের মাথার ওপর কত মণ বোঝা-চাপানো হয়েছে! সংসারের দুঃখ-কষ্টে তোমরা তো জ্বলে-পুড়ে মরছ। তাই তোমরা একটু প্রার্থনা করলেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান, অমনি তাড়াতাড়ি এসে মাথার বোঝা নামিয়ে দেন। সে-প্রার্থনা কিন্তু আন্তরিক হওয়া চাই। সংসারের কাজকর্ম তো আছেই। এ সৃষ্টি যতদিন আছে, ততদিন কাজকর্মও থাকবে। কিন্তু তারই মধ্যে একটু সময় করে নিভৃতে ডাকতে হবে। নচেৎ বড় মুশকিল, বড় বিপদ। তাঁকে ধরে থেকে সংসার করলে আর তত ভয় নেই। সব কাজের ভেতর তাঁর স্মরণ মনন করা, তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। এক হাতে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সর্বক্ষণ ধরে থাকবে, আর এক হাতে করবে সংসারের কাজকর্ম। কর্ম-অন্তে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে হবে তাঁর শ্রীচরণ।

বেলুড় মঠ

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ—জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৩০

বিভিন্ন সময়ের ঘটনা

একজন ভক্ত মঠে যোগদান করার আশায় কর্মস্থান হইতে আসিয়া মঠে কিছুদিন বাস করিতেছেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে বলিতেছেন—ওরা (বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন) কি টের পেয়েছে যে, তুমি আর যাবে না?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ।

মহাপুরুষজী—তা বেশ। এদের সব ভোগবাসনা আছে—খুব ভোগ করুক। তোমার ঠাকুরের কৃপায় ভোগবাসনা কেটে গেছে; তুমি এখন এখানেই থাক। ওরা সব আমড়ার অম্বল খাক যতদিন ইচ্ছে।

*　　　*　　　*

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসব। আকাশ মেঘলা; একটু বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। উৎসবের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। একজন সেবক আসিয়া বলিলেন—মহারাজ, আপনাকে চেয়ারে করে নিচে নিয়ে যাব—উৎসবের সাজানো সব দেখবেন।

মহাপুরুষজী—না, I don't like to create a scene—আমি কোন তামাশা সৃষ্টি করতে চাই না। সকলের খুব আনন্দ, ভক্তি, প্রীতি, শান্তি হোক। ঠাকুর সর্বসাধারণের কল্যাণ করুন—তাতেই আমার আনন্দ। ঠাকুরের ইচ্ছায় মেঘ ও বৃষ্টিটা হওয়ায় ঠাণ্ডা হয়েছে; নইলে লোকজনের বড় কষ্ট হতো। তাঁর কাজ তিনি ঠিক করে নেবেন।

বিকালে মঠের গরুগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আহা! ওরা বুঝি আজ আর বেরুতে পারবে না। ওদের বড় কষ্ট হবে।

সন্ধ্যার সময় আবার গরুগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—ওদের খেতে দিয়েছে কি? সেবক খোঁজ লইয়া বলিলেন—হাঁ, দিয়েছে। মহাপুরুষজী শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

*　　　*　　　*

পূর্ববঙ্গের এক সাধিকা-মহিলার কথা উঠিল। মহিলাটি খুব সাধন-ভজন করেন এবং বেশ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। মহাপুরুষজী বলিতেছেন—এ-সব তাঁর কৃপা। দেবীসূক্তে আছেঃ 'যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্'—আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি, ব্রহ্মা করি, ঋষি করি এবং প্রজ্ঞাশালী করি। তাঁর কৃপাই আসল—তা পুরুষশরীরে বা স্ত্রীশরীরে যাতেই হোক।

বেলুড় মঠ

১৩৩৬-১৩৩৭ বঙ্গাব্দ—এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

বিভিন্ন সময়ের ঘটনা

রামনবমী। তুলসীদাসের কথা হইতেছে। মহাপুরুষজী বলিতেছেন—তুলসীদাস খুব নাম প্রচার করে গেছেন। নাম আর নামী এক জিনিস। হরিনাম—রামনাম। তুলসীদাস কত বড় ভক্ত ছিলেন! আজ খুব রামনাম কর। রাম রাম সীতারাম।

জনৈক সন্ন্যাসী গলার মালার সঙ্গে একটি কবচে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি ধারণ করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে বলিতেছেন—দাও, আমাকে দাও। ঐ তো ধারণ করতে হয়। দাও আমার মাথায় দাও।

তাঁহার শরীরের কথা হইতেছে। বলিলেন—শরীর এখন খারাপ হয়ে গেছে, আর কিছু নেই। ঠাকুর যতদিন ইচ্ছা খাড়া করে রেখেছেন ও রাখবেন। শরীর থাকলে তাঁর সব শুভ কাজের একটু প্রসার হয়—এই আর কি!

একজন সাধু পূর্বাশ্রম হইতে পিতামাতা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিয়াছেন। সেখানে প্রায় হাজার লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। মহাপুরুষজী বলিতেছেন—তা

বেশ, একজন সন্ন্যাসীকে ওরা দেখলে। ভালই হবে। খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। সাধুকে আশীর্বাদ করিতেছেন—তোমার খুব শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান হোক। দুই-ই এক।

একজন স্ত্রীভক্ত আত্মহত্যা করিয়াছেন। সেই কথা সেবকের সঙ্গে হইতেছে। মহাপুরুষজী বলিতেছেন—আফিং খেয়ে মরেছে, শুনেছ? যাক রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে—তা তার আত্মা ঠিক ঠাকুরের কাছে যাবে। ঠাকুরের ভক্ত ছিল; মঠের, সাধুদের ও আমাদের উপর বেশ টান ছিল। প্রারব্ধ ছিল, তাই করেছে। নিশ্চয় সদগতি হবে। তবে কিছুদিন অন্ধকারের মতো আবরণের ভিতর থাকতে হবে।

জনৈক পারসী ভক্তের চিঠি আসিয়াছে। সেবককে বলিলেন—বেশ গুছিয়ে ভাল করে লিখে দাও যে, সে যা করছে তা ঠিকই করছে। জরথুস্ট্ররূপে ঠাকুরই এসেছিলেন; আবার সেই জরথুস্ট্রই ঠাকুররূপে এসেছেন।

পরে একজন প্রুসিয়ান ইহুদী ভদ্রলোকের কথায় বলিতেছেন—লোকটি বৈজ্ঞানিক। যুদ্ধের সময় কি একটা খাবার আবিষ্কার করেছিল—রাঁধতে হয় না। বলেছিল—'ইচ্ছা করলে ক্রোড় ক্রোড় টাকা করতে পারতুম।' বেশ ভাল মানুষ। প্রথমটা আডায়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে এসে থাকে। তার ইহুদী ধর্ম ভাল লাগে না। থিওসফিও তার পছন্দ হলো না। তারপর মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমে এসেছিল। পরে মঠে এসে দেখা করে। প্যালেস্টাইন, জেরুজালেম এ-সব দেখতে গিয়েছিল। তা তার ভাল লাগেনি। বললে—'না, ওখানে ধর্মভাব নেই।' এখন আমেরিকায় আছে।

আমেরিকায় কয়েকখানি চিঠি লিখিতে হইবে—সেই কথা হইতেছে। বলিতেছেন—এ-সব চিঠি-পত্র লেখাতে একটা প্রীতির ভাব প্রকাশ হয়। অবশ্য ভিতরকার দৃষ্টি খুলে গেলে দেখা যায় সবই ব্রহ্ম—'একত্বমনুপশ্যতঃ কেন কং বিজানীয়াৎ'—যিনি একত্ব দেখেন, তিনি আলাদা আর কাকে জানবেন? তবে বাইরে আবার এই নানাবুদ্ধিপ্রসূত একটা ভাবের আদান-প্রদান দরকার।

ঢাকার দাঙ্গার কথা হইতেছে। মহাপুরুষজী বলিতেছেন—মা কেন এমন করলেন। ঠাকুরই ভরসা—তিনি রক্ষা করবেন। ঢাকাতে কখনও এতটা হয়নি। মায়ের ধ্বংসলীলা চলছে। 'Out of evil cometh good'—মন্দ থেকে ভাল হয়। এ থেকেও কল্যাণ হবে; তিনি দয়া করুন, শান্তি দিন সকলের। কারুরই অনিষ্ট না হোক এই চাই।

একজন সাধু প্রায় এক মাস কঠিন অসুখে শয্যাগত ছিলেন। একটু সুস্থ হইয়া উপরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বলিতেছেন—এস, এস! আরে ন—উপরে এসেছে! বেশ বাবা, ঠাকুরের কৃপায় ভাল হয়েছে। ঠাকুর তোমাকে ভাল করেছেন। জয় ঠাকুর! তোমাদের কোন ভাবনা নেই। সবাইকে ঠাকুর দয়া করবেন। তোমার দেহ-মন সমস্ত ঠাকুরকে অর্পণ করেছ, তাঁর আশ্রয় নিয়েছ, তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন। স্বাস্থ্যলাভ, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি সব ঠাকুর দেখবেন। আচ্ছা,

যাও বাবা, আর দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট করো না। অ্যাঁ, কেমন হয়ে গেছে ফ্যাকাশে! আবার খেলে-দেলে রক্ত হবে। জয় ঠাকুর! খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মঠের বিস্তৃত মাঠের চোরকাঁটা অনেকটা তোলা হইয়াছে—উপরের আফিস ঘরের জানালা হইতে মহাপুরুষজী চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন—বেশ বেশ, মাঠ পরিষ্কার হচ্ছে; গরুগুলি এখন ঘাস খেতে পারবে আর তোমাদের আশীর্বাদ করবে।

আর একদিনের ঘটনা। একজন ভক্তের পত্র আসিয়াছে। বলিতেছেন—ঠাকুরের নাম যথাসাধ্য করছে। একটু ভালও লাগে—ঐটুকু হলেই বেঁচে যাবে। নামে প্রীতি হলে আর ভাবনা নেই। গোলমাল কত রকম তো আছেই—থাকবেও। খুব ঠাকুরের নাম করুক, তবেই কল্যাণ হবে। জন্মাষ্টমীতে রাত তিনটা পর্যন্ত পুজো করেছিল—বেশ, বাঃ বাঃ!

মহাপুরুষ মহারাজ শুইয়া আছেন। দেবীর নামাবলী, বেদান্তের বাক্যসংগ্রহ এবং দেবীসূক্তটি শায়িত অবস্থাতেই অনেকক্ষণ পাঠ করিলেন। তারপর উঠিয়া বলিতেছেন—চমৎকার, চমৎকার! খাসা খাসা চিন্তাপ্রবাহ সব আসছিল। সেই শিব স্থির হয়ে আছেন, আর মা তাঁর উপর নাচছেন। শিব তো চিরকালই স্থির; আর মায়ের নাচ তো চিরকালই চলছে। ভিতরে স্থির বরাবর—বাইরে এই লীলাময়ীর লীলা।

জনৈক ব্রহ্মচারী একদিন প্রশ্ন করিলেন—জ্ঞানের দিকে যখন ঝোঁক হয়, তখন ইষ্টমন্ত্র জপ না করে শুধু ওঁকার জপ করা চলে কি?

মহাপুরুষজী—হাঁ। বেশ তো। সেই ওঁকারই তো ভগবান। ঠাকুরকে ওঁকারভাবে চিন্তা করা চলে। কোন আপত্তি নেই। তবে ইষ্টমন্ত্র একেবারে বাদ দিও না।

কয়েকদিন পরে সেই ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, ওঁকার করছ? ব্রহ্মচারী 'হাঁ' বলাতে তিনি খুব উৎসাহ দিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, বেশ। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন—কিন্তু মহারাজ, ওঁকার জপ করতে করতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বড় ভয় হয়। মহাপুরুষজী বলিলেন—ঐরকম যখন হয় তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেঃ 'হে ঠাকুর, তুমিই ওঁকারস্বরূপ। আমি যাতে ঠিক পথে যাই, তাই কর। যাতে ঠিক বস্তু—যা সেই জ্ঞান বা ভক্তি (সেই একই বস্তু)—লাভ করতে পারি, তাই কর।' এই রকম খুব প্রার্থনা করবে।

একজন সাধুর কঠিন পীড়া হইয়াছে। মহাপুরুষজী তাঁহার জনৈক সেবককে বলিতেছেন—আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে ওকে একবার দেখে আসি। চেয়ারে বসিয়ে দুজনে ধরে আমায় নিয়ে যাবে নিচে? রোগীর কাছে গেলে খুব উপকার হয়। সহানুভূতির দরকার। দশজনের সহানুভূতিতে অসুখ ভাল হয়ে যায়।

জনৈক সেবক অসুস্থ হওয়ায় আর একজন সাধু তাঁহার পরিবর্তে দুদিন রাত্রে মহাপুরুষজীকে দু-ঘণ্টা করিয়া বাতাস করিতেছেন। তৃতীয় দিন তাঁহাকে বলিতেছেন—তোমার বড় কষ্ট হবে, থাক—দরকার নেই। তখন ঐ সাধু বিনীতভাবে বলিলেন—না, না, মহারাজ! কিছু কষ্ট হবে না। আপনাদের সেবা না করলে আমাদের কল্যাণ হবে কি করে?

মহাপুরুষজী—হাঁ, তা ঠিক। আমরা বুড়ো সাধু, আর ঠাকুরের দাস; আমাদের সেবা করলে কল্যাণ হবে, এতে সন্দেহ নেই।

একবার মঠের একজন সন্ন্যাসী খুব ব্যাকুল হইয়া মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে দেখাই কি সার হবে? আমাদের কি কোন উপলব্ধি হবে না? মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ খুব আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—না, না, ছবিতে কেন? (হৃদয় দেখাইয়া) এইখানেই সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্তি উপলব্ধি হবে।

আজ জন্মাষ্টমী। জনৈক সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জন্মাষ্টমীর দিনে ঠাকুরের কোন বিশেষ ভাব-টাব হতো কি?

মহাপুরুষজী—তা অত কি মনে আছে? তাঁর তো একটু কিছু হলেই ভাব হয়ে যেত। 'কথামৃতে' তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তাও তো অসম্পূর্ণ। মাস্টারমশাই তো সব দিন যাননি, আর যা শুনেছেন, সব কি লিখতে পেরেছেন? অবশ্য ওঁর স্মৃতিশক্তি খুব ছিল। কিন্তু তা হলেও শুনে আর কতটা লেখা যায়?

সন্ন্যাসী—স্বামীজীর একটা ইচ্ছা ছিল যে, ঠাকুর তাঁর ছেলেদের প্রত্যেককে যে-সব বিশেষ বিশেষ উপদেশ দিতেন, সেগুলি প্রত্যেকের নিকট হতে সংগ্রহ করে রাখা।

মহাপুরুষজী—তা সে-সব এখন কি করে পাবে? সে-লোক তো অধিকাংশই নেই।

সন্ধ্যাবেলায় একজন ভক্তকে মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেছেন—যাও, আরতি দর্শন কর গে। বেলুড় মঠে ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন—স্বামীজী বসিয়ে দিয়ে গেছেন, সত্য জানবে।

ঠাকুরের পূজারী একদিন প্রণাম করিতেই মহাপুরুষ মহারাজ ভাবস্থ হইয়া 'জয় গুরু মহারাজ, জয় গুরু মহারাজ' বলিয়া উঠিলেন। একটু পরে পূজারীর দিকে সস্নেহে তাকাইয়া বলিলেন—বেশ, তুমি ঠাকুরের পুজো করছো। খুব ভক্তিবিশ্বাস হোক। পুজোশেষে এই বলে প্রার্থনা করবে—'ঠাকুর, তোমার পুজো তুমি কৃপা করে করিয়ে নাও। আমি তোমার পুজোর কি জানি?' যারা যারা ঠাকুরের সেবার কাজ করছে এখানে, সকলেরই মহাকল্যাণ হবে। অনেকে বলে—ঠাকুর তো সব জায়গায় আছেন। হাঁ, সত্য; কিন্তু এখানে (মঠে) তাঁর বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী বসিয়ে গেছেন এখানে—সেই যে আত্মারামের কৌটা।

আর একদিন মহাপুরুষজী উক্ত পূজারী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বিকালে ঠাকুরঘর খুলে একটু জপটপ কর তো?

পূজারী—হাঁ, মহারাজ।

মহাপুরুষজী—হাঁ, সর্বদা ওখানে একটা ভাবধারা বজায় রাখতে হবে। ঠাকুরঘরে গেলে মনে হবে যেন সাক্ষাৎ ভগবানের কাছে এসেছি। তিনি ভক্তি ভক্ত ভালবাসেন। তা নইলে সগুণ ঈশ্বর কি? শুধু একটু ধ্যান করলাম—ওতে চিঁড়ে ভেজে না! ভক্তি চাই, দুই-ই চাই।

সকালে অনেক সাধু মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়াছেন। সংখ্যা রাখিয়া মালাজপের কথা উঠিল। মহাপুরুষজী বলিলেন—মোটা বুদ্ধি যাদের, তারা বলে—যত বেশি সংখ্যা জপ করবে, তত তাঁর বেশি দয়া হবে। তিনি কি সংখ্যা দেখেন? তিনি দেখেন প্রাণ। হৃদয় কতটা তাঁর দিকে গেল তাই দেখেন। ভাব যদি জমে যায় তো সংখ্যা নাই রাখলে।

জনৈক সাধু—হাঁ, মালাজপ করাটাও অনেক সময় বিক্ষেপ বলে মনে হয়।

মহাপুরুষজী—তা বইকি। আমি মালা-টালা জপিনে। তুলসীদাস* বলেছেন—'মালা জপে শালা।' তবে একটা রাখতে হয়—দেখাতে হবে তো সাধু (হাস্য)। ঐ একটা (দেয়ালস্থিত নিজের ফটোর গায়ে ঝুলানো মালা ছড়াটি দেখিয়ে) রেখেছি। জপা-টপা হয় না। এ-ই (ছবিটাই) জপে (হাস্য)। ঠাকুর বলতেন—প্রথমে জপ, পরে ধ্যান, তারপরে ভাব, সমাধি ইত্যাদি।

বিকালে মহাপুরুষ মহারাজ উপরে গঙ্গার দিকের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। বারান্দার একপাশে পূজনীয় খোকা মহারাজ ইজি চেয়ারে বসিয়া ভাগবত পড়িতেছেন। মহাপুরুষজী খোকা মহারাজের দিকে চাহিয়া একজনকে বলিতেছেন—খোকা মহারাজ খুব ভাগবত পড়ছেন।

সেবক—হাঁ, আর পুরাণ ইত্যাদিও পড়ছেন। শিবপুরাণ পড়ছেন।

খোকা মহারাজ—হাঁ, একটা কিছু নিয়ে থাকা।

মহাপুরুষজী—একটা কিছু কেন? ভাগবত কি কম? পুরাণ ভাগবতাদিতে তো সেই সত্যের কথাই বলেছে।

সন্ধ্যার পর ঐ বারান্দা হইতে পূর্ণচন্দ্রালোকে আলোকিত গঙ্গা দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ করজোড়ে বলিতেছেন—জয় মা, জয় মা! ভক্তি দাও, গঙ্গে।

রক্তের চাপ বাড়িয়াছে। ডাক্তারেরা বেশি কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেই কথা মহাপুরুষজীর কাছে সেবক উত্থাপন করাতে তিনি বলিলেন—আমি, বাবা, রামকৃষ্ণের চেলা। তিনি অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ! আর আমি চুপ করে বসে থাকব? শরীর খারাপ, তা কি হবে? তোমরা এসে শুধু প্রণাম করে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে—'রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম'।

* কেহ কেহ বলেন—'মালা জপে শালা' ইত্যাদি দোঁহাটি কবিরদাসের।

২৮ বৈশাখ, রবিবার, ১৩৩৭—১১ মে, ১৯৩০

রাত্রিবেলা জনৈক দক্ষিণদেশীয় সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া নিজের প্রাণের আর্তি জানাইয়া বলিলেন—মহারাজ, আমি ভগবানকে সর্বভূতে দর্শন করতে চাই। কি করে তা সম্ভব, আপনি দয়া করে আমায় বলে দিন।

মহাপুরুষজী—বাবা, আগে ভগবানকে নিজ হৃদয়ে দর্শন করতে হবে। অন্তরে তাঁর দর্শন না হলে বাইরে সর্বভূতে তাঁকে দেখা কি করে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তরে বাইরে সর্বত্র তাঁর দর্শন হয়; তখনই 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই অবস্থা লাভ হয়।

সন্ন্যাসী—সত্য কথা, সর্বভূতে দয়া ও প্রেম, নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা ইত্যাদি নৈতিক গুণের উৎকর্ষ ও পূর্ণতাসম্পাদনে সে-অবস্থায় পৌছানো যায় কি?

মহাপুরুষজী—হাঁ, নৈতিক চরিত্রগঠনে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদভাবের স্ফুরণ হয়। কিন্তু কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্রের গঠন করলেই যে ভগবদ্দর্শন হবে, তা তো আমার মনে হয় না। নিরন্তর তাঁর ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা করে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন। চাই তাঁর ধ্যান—সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যো সো করে একবার ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদা করে নৈতিক চরিত্রগঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম ও সকল সদ্‌বৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে-ছেলের হাত ধরেছে, সে-ছেলের আর পড়ে যাবার ভয় নেই। আসল কথা কি জান, বাবা?—কৃপা, কৃপা। তিনি কৃপা করে দর্শন দিলেই মানুষ তাঁর দর্শন পেতে পারে। ভজনসাধন এ-সব মনকে ভগবন্মুখী করার উপায় মাত্র।

ইহা বলিয়া মহাপুরুষজী মধুরকণ্ঠে গান ধরিলেন—

'তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়?
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার।
ওহে নাথ, সাধ্য কার ধ্যানেতে ধরে তোমায়?
মনেরে বুঝাই কত, তুমি বাক্যমনাতীত।
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়।।
দিয়ে দীনে দরশন, করহে দুঃখমোচন।
ওহে লজ্জানিবারণ, শীতল কর হৃদয়।।'

খুবই তন্ময়ভাবে গানটি গাহিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—ঠাকুর বলতেন যে, কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। এই পাল তুলে দেওয়াই হলো পুরুষকার—সাধন-ভজন। ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করার মতো করে নিজেকে তৈরি করতে হবে—ভজন-সাধন দ্বারা। বাকি তাঁর কৃপা। নিরন্তর তাঁর স্মরণ-মনন, তাঁর ধ্যান করতে করতে মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর ঐ শুদ্ধ মনে স্বতই ভগবদভাবের স্ফুরণ হয়, ভগবৎ-কৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া তোমরা সাধু হয়েছ, সব ছেড়েছুড়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান লাভ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের তো তাঁকে নিয়েই সর্বক্ষণ থাকতে হবে। ঠাকুরের কথায় আছে না যে, মৌমাছি ফুলেই বসে—মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সর্বাবস্থায় ভগবানকে নিয়েই বিলাস করবে। তাঁর ধ্যান, তাঁর নামজপ, তাঁর বিষয় স্মরণ, তাঁর বিষয় পাঠ, আলোচনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা—এই-সব নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তাঁর আশ্রয়ে আসাও হবে সার্থক। ভগবান অন্তর্যামী। যেখানে আন্তরিক ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কৃপাও হয়। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।

বেলুড় মঠ

৯ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩৭—২৩ মে, ১৯৩০

জ্যৈষ্ঠ মাস, খুব গরম পড়িয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজের রাত্রে প্রায়ই ঘুম হয় না। সকালবেলার দিকে শরীর খারাপ থাকে, তাই বিছানায় বসিয়াই সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করেন। প্রাতরাশ শেষ করিয়া উপরেই একটু পায়চারি করিতেছেন। হাঁটিতে কষ্ট হয়, তবু একটু একটু অভ্যাস রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই ক্লান্ত হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তারপর নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন, একটু বিশ্রাম করিবেন। আস্তে আস্তে চলিতেছেন এবং কাছে যাহারা আছে তাহাদিগকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—থপ্ থপ্ থপ্!

নিজের খাটে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখনা, শরীরের কি অবস্থা হয়েছে! দুপা চলা, তাও পারিনে, একেবারে invalid (অথর্ব) করে ফেলেছে। সবই মহামায়ার খেলা। এই শরীরই তো একদিন পাহাড়ে-পর্বতে কত চড়াই-উতরাই করেছে, কত হেঁটে বেড়িয়েছে, কত সব মহা কঠোরতা করেছে! আর এখন দেখনা দুপা চলতেই কষ্ট—নিচে নামা তো কদিন বন্ধ হয়ে গেছে! আগে কত বেড়িয়েছি, কত জায়গায় গিয়েছি। তা ঠাকুরের ইচ্ছায় ঘোরা ঢের হয়েছে; এখন আর কোথাও যাবার ইচ্ছেও হয় না। যাওয়া

আসার বাসনা পর্যন্ত মুছে দিয়েছেন ঠাকুর। এখন কোন বাসনাই নেই। যে অবস্থায় ঠাকুর রাখেন তাতেই আনন্দ। বাহিরের activity (ক্রিয়া) যত কমে যাচ্ছে ততই ভেতরের activity বেড়ে যাচ্ছে। বহির্জগৎ থেকে মন যত উঠে যাচ্ছে ততই ভেতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর ঠাকুর কৃপা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছেন—সেই দেহ, মন, বুদ্ধির অতীত জিনিস। এখন প্রাণশক্তির ক্রিয়া ভেতরে খুব চলেছে। শাস্ত্রে যে-সব অনুভূতির কথা লেখা আছে, সে-সব প্রভু কৃপা করে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছেন।

শরীর তো আর আমি নই। আর এই যে ষড়বিকার, এ তো দেহের। আমি তো নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সনাতন সেই পরমপুরুষ। ঠাকুর কৃপা করে সে-জ্ঞান খুব দিয়েছেন, খুব পাকা করে দিয়ে রেখেছেন। কাজেই দেহের সুখ-অসুখে, জরা-ব্যাধিতে কিছুই মনে হয় না। দেহের ধর্ম দেহে তো থাকবেই। আগে আগে যে-সব জ্ঞান বা অনুভূতি চেষ্টা করে আনতে হতো, তা এখন বিনা চেষ্টাতেই আসছে। ঠাকুর কৃপা করে সেই-সব উচ্চ উচ্চ অনুভূতি দিচ্ছেন। সেই অমৃত-ধামের পথ তিনি কৃপা করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। দেশ, কাল, পাত্র এ-সমস্তই বাইরের জিনিস। মন যখন সমাহিত হয়, এ-সবের বোধ কিছুই থাকে না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিতেছেন—আগে যখন আলমোড়ার দিকে থাকতুম, তখন হিমালয়ের অনেক মনোরম স্থানে বেড়িয়েছি। সে-সব স্থান বাস্তবিকই সাধন-ভজনের পক্ষে খুব অনুকূল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও তুলনা হয় না। সে-সব জায়গায়ও ধ্যান করতে করতে দেখেছি—মন যখনই একটু ভেতরের দিকে যেতে আরম্ভ করে, তখনই গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, শীত-গ্রীষ্ম এ-সব বোধ আর থাকে না। শরীর আছে কি নেই, সেই জ্ঞানও থাকে না, তা অন্য সব বাহ্যিক জিনিসের আর কা কথা! সেই অনন্ত সৌন্দর্যের আকর প্রেমাস্পদ ভগবানের শ্রীচরণে মন যখন একবার লীন হয়, তখন এ-সব বাহ্যিক সৌন্দর্যে মন কি আর বসে, না তাতে আনন্দ পাওয়া যায়? সেই ভূমানন্দের আস্বাদ একবার পেলে জাগতিক সব আনন্দই অতি তুচ্ছ বোধ হয়। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখং অস্তি, ভূমৈব সুখম্'—যাহা ভূমা অর্থাৎ অনন্ত, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। সেই বিরাট ভগবানের একাংশে এই জগৎ-সংসার, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, আরো কত কি লোকের সৃষ্টি হয়েছে, আর বাকি সবই রয়েছে অব্যক্ত—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' তাঁকে কেউ কখনো জানতে পারেনি, আর পারবেও না। মানুষ ক্ষুদ্র মন-বুদ্ধি দিয়ে সেই বিরাট ভগবানকে কি করে জানবে? তাই তো ভগবান গীতায় বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।

—অথবা হে অর্জুন, এই-সব বহু বস্তু জানিয়া তোমার লাভ কি? এককথায় বলিতে গেলে, আমিই এই সমগ্র জগৎকে আমার একাংশে ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছি।

'একাংশেন'—এই একাংশে যে কি আছে, তা-ই মানুষ ইয়ত্তা করতে পারছে না, অন্য সব তো দূরের কথা। অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সব নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা গভীর গবেষণা দ্বারা নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে কত সব নতুন গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি আবিষ্কার করছে। কিন্তু এখনো এমন ঢের ঢের জিনিস আছে যার ইতি করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। আর যন্ত্রাদির সাহায্যে তারা যা দেখেছে, তাই যে অভ্রান্ত তা তো নয়। দশ বৎসর আগে বলেছে এক রকম, আবার দশ বৎসর পরে তারাই মত বদলাচ্ছে। তাই তো ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা, আমি তোমাকে জানতে চাইনে। আর তোমাকে কে কবে জেনেছে বা জানতে পারবে? তবে এই করো—তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।' জীবনের উদ্দেশ্যই হলো তাই—যো সো করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মতি রাখা। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে একবার মনের লয় হয়ে গেলে, আর ভয় নেই।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।'

আর সেই শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান তাঁর কৃপা ছাড়া হবারও জো নেই। তবে তিনি কৃপা করে দেনও। আন্তরিক শরণাগত হয়ে পড়ে থাকলে তিনি অবশ্যই দয়া করেন। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াও, সব তীর্থ পর্যটনই কর, কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার জো নেই। তাই তো ছেলেদের বলি যখন এখানে সেখানে যাবার গোঁ ধরে, 'বাবারা সব, কোথায় ছুটাছুটি করে বেড়াবে? শরণাগত হয়ে ঠাকুরের দুয়ারে পড়ে থাক আর কিছুই করতে হবে না। চাই কেবল আন্তরিক শরণাগতি।' আমরাও সব শরণাগত হয়ে পড়ে আছি। আমাদের তিনি কৃপা করে খুব দিয়েছেন, আরো দিচ্ছেন। আমি আন্তরিক প্রার্থনা করছি, তোমাদের সকলেরই সেই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণভক্তি লাভ হোক (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুহাত তুলিয়া)—'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।'

বেলুড় মঠ

৯ আষাঢ়, ১৩৩৭—মঙ্গলবার, ২৪ জুন, ১৯৩০

মহাপুরুষজী খুব তন্ময়ভাবে এই গানটি গাহিলেন—

"শ্যামা-মা কি কল করেছে! কালী মা কি কল করেছে!
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে!
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।।"

ইত্যাদি গানটি বারংবার গাহিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। পরে বলিতেছেন আপন মনেই—আমরা জানি মা-ই সত্য, মা দয়াময়ী আর কিছুই জানিনে, বুঝিনে, জানবার দরকারও নেই।

খানিকপরে জনৈক ব্রহ্মচারী সাধন-ভজনে উন্নতি করিতে পারিতেছে না বলিয়া নিজের মানসিক অবস্থা ও অশান্তি জানাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করাতে তিনি খুবই আবেগভরে বলিলেন— মা তোমায় খুব কৃপা করুন, তোমার মনের সব অশান্তি দূর করে দিন। পড়ে থাকো, বাবা, তাঁর দুয়ারে; তিনি ক্রমে সব ঠিক করে দেবেন। কিছুতেই হতাশ হয়ো না। খুব প্রাণভরে তাঁর নাম করবে, আন্তরিক প্রার্থনা করবে—'ঠাকুর, তুমি দয়া কর। আমি অতি অবোধ, তোমাকে কি করে ডাকতে হয় জানিনে। তুমি কৃপা কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ ভক্তি, পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ জ্ঞান দাও। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি দয়া কর। আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও।'

তুমি নিজের ভজন-সাধন নিয়ে থাকবে। অন্যে কি করল না করল তা দেখে তোমার কি হবে? যে করবে তারই হবে, সে-ই আনন্দ পাবে। ভগবানের চিন্তা বড় সহায়ক জিনিস—ঐ তো সারবস্তু। ধ্যান-জপ করলে, ভগবানের নাম করলে, বুদ্ধি-সুদ্ধি সব ঠিক হয়ে যাবে, রিপুদমন হয়ে যাবে। খুব অনুরাগের সঙ্গে একটু করেই দেখ। কর, বাবা, কর। খুব প্রেমের সঙ্গে তাঁর নাম করে যাও। না করলে কিছুই হবে না। তাঁর নামেই সব শক্তি নিহিত আছে।

বেলুড় মঠ

২৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭—১০ জুলাই, ১৯৩০

তিন-চার দিন অনবরত মুষলধারে বৃষ্টির পর আজ একটু রৌদ্র উঠিয়াছে। আজ গুরুপূর্ণিমা। মঠে বহু ভক্ত-সমাগম হইয়াছে। দীক্ষাদিও কয়েকজনের হইয়া গিয়াছে। বিকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনেকেই প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। তিনিও সকলকে সস্নেহে কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নবদীক্ষিত ভক্তগণ আসিয়া বসিয়াছেন, কিছু প্রশ্নাদি করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, নিত্য কত জপ করতে হবে, তার কি কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে?

মহারাজ—না, তার কিছুই নিয়ম নেই। জপ যত করতে পার, ততই ভাল। যত বেশি করবে ততই মঙ্গল। তবে যদি কারো এমন ইচ্ছে হয় যে, রোজ পাঁচ হাজার জপ করব, কি দশ হাজার জপ করব, তা সংখ্যা রেখে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পার। সে তো খুব ভালই।

ভক্ত—যদি রাস্তায় চলতে চলতে জপ করবার ইচ্ছে হয়, তা করতে পারি?

মহারাজ—খুব করবে। জপ করা, ভগবানের নাম করা যখন ইচ্ছা হয় তখনই করতে পার। সর্বাবস্থায় ভগবানের নাম জপ করা চলে। তাতে কালাকাল নেই, স্থান-অস্থান নেই। প্রেমের সঙ্গে নাম করতে হবে। তবেই আনন্দ পাবে ও প্রাণে শান্তি আসবে। যখন বেশ ভেতর থেকে ইচ্ছা হবে, তখনই জপ করবে—তা দশ মিনিট হোক, আধ ঘণ্টাই হোক, আর এক ঘণ্টা কি আরো বেশিই হোক। urge (জোর) কিছু করো না, জোর করে করলে তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। এ হলো প্রেমের সম্বন্ধ। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে-সম্বন্ধ তা হলো ভালবাসার সম্বন্ধ। এতে জোর-জারের কিছুই নেই। আর খুব প্রার্থনা করবে প্রাণভরে—'হে প্রভু, আমাকে তোমার আপনার করে নাও। আমি অবোধ, তোমায় কি করে ভালবাসতে হয়, কিছুই জানিনে। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার দিকে টেনে নাও, আর তোমাকে ভালবাসতে শেখাও।'

অপর একজন নবদীক্ষিত ভক্ত—মহারাজ, আমাদের কি প্রাণায়াম অভ্যাস করা দরকার?

মহারাজ—প্রাণায়াম করতে তো আমরা বড় একটা কাউকে বলিনে। দরকারও নেই।

ভক্ত—আপনি প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে বলেছেন যে, ভগবানের নাম করতে করতে আপনি বায়ুরোধ হয়ে যায়।

মহারাজ—হাঁ, তাই তো হয়। খুব প্রেমের সঙ্গে নাম করলে ক্রমে মন স্থির হয়ে আসে এবং প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়ে থাকে। তবে জপের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে কর তো বায়ু ভেতরে ধারণ করতে পার। কিন্তু পূরক, কুম্ভক, রেচক ইত্যাদি রাজযোগে যেমন আছে, তেমন করবার কিছুই দরকার নেই। আসল কথা হচ্ছে প্রেম ও আন্তরিকতা। ভগবান সত্যস্বরূপ, অন্তর্যামী। সকলের হৃদয়ে তিনিই চৈতন্যরূপে রয়েছেন। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু তিনি। তাঁর কৃপা ছাড়া, বাবা, কিছুই হবার জো নেই। জপ কর, ধ্যান কর, প্রাণায়াম কর, যাগ যজ্ঞ ব্রতাদি যাই কর না কেন, কিছুতেই কিছু হয় না যদি তাঁর কৃপা না হয়। তবে কেউ যদি আন্তরিক তাঁকে চায়, তবে তিনি কৃপা করে তাকে দর্শন দেন—সেও সত্য।

ভক্ত—সন্ধ্যা গায়ত্রী এ-সব করব কি?

মহারাজ—সন্ধ্যা গায়ত্রী ও-সব বৈদিক উপাসনা। ও-সব করা খুব ভাল। তবে সন্ধ্যা করতে যদি কোনপ্রকার অসুবিধা থাকে তো বরং না করলে। কিন্তু গায়ত্রী-জপ অবশ্য করবে। গায়ত্রী অতি উচ্চাঙ্গের উপাসনা। সেই আদিপুরুষ, যিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি লোকের প্রসবিতা, তাঁর কাছে প্রার্থনা—যাতে তিনি আমাদের সদ্বুদ্ধি দেন।

ক্রমে ক্রমে ভক্তেরা সব ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। একজন নবদীক্ষিত ভক্ত বসিয়া আছেন, কিছু গোপনীয় কথা বলিবেন, এই ইচ্ছা। এখন মহারাজকে একাকী পাইয়া ভক্তটি

মৃদুস্বরে সকরুণভাবে প্রাণের কথা বলিতেছেন—মহারাজ, আমি জীবনে অনেক গর্হিত কার্য করেছি। আমি মহাপাপী। আপনি কৃপা করে আমাকে চরণে স্থান দিন, কৃপা করুন, নইলে আমার গতি কি হবে! আমি যদি আমার নিজ জীবনের সব পাপের কথা বলি তো আপনিও আমাকে ঘৃণা করবেন। এই বলিয়া একটু থামিয়া আরো বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মহারাজ খুব গম্ভীরভাবে, ভাবাবেশে—মুখ চোখ লাল হইয়া গিয়াছে—বলিলেন ঃ বাবা, ভয় কি! আজ থেকে তুমি সব পাপ থেকে মুক্ত হলে—এইটি বিশ্বাস কর। ঠাকুর যখন কৃপা করে তোমাকে তাঁর চরণে স্থান দিয়েছেন, তখন আর ভয় কি, বাবা? এখন যে তুমি তাঁর হয়ে গিয়েছ। আমাদের ঠাকুর অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, দীনদয়াল, কপালমোচন। তুমি এখন তাঁর চরণাশ্রিত। আজ থেকে তুমি নবকলেবর ধারণ করলে, তোমার পুনর্জন্ম হয়ে গেল, তুমি আর সেই পাপী তাপী নও, বাবা। আজ থেকে তুমি তাঁরই সন্তান, তাঁরই দাস হয়ে গেলে। বুঝলে, বাবা? ঠাকুর কৃপা করে তোমার গায়ের ধুলো কাদা ঝেড়ে তোমাকে আদর করে কোলে টেনে নিয়েছেন। এখন অতীতের সব দুষ্কৃতির কথা ভুলে যাও, ও-সব ভাবনা মনে উঠতেও দিও না। এখন আনন্দের সঙ্গে খুব প্রেমভরে তাঁর নাম করে যাও, জীবন মধুময় হয়ে যাবে।

ভক্ত—মনের গতি এখনো ফেরাতে পাচ্ছিনে। রিপু-দমন যাতে হয় তাই আশীর্বাদ করুন।

মহারাজ—আশীর্বাদ তো আছেই, তোমাকেও একটু চেষ্টা করতে হবে। তোমার তো ছেলেপিলে হয়েছে, এখন থেকে একটু সংযম অভ্যাস করতে শেখ। এখন হতে জীবনের ধারা পরিবর্তন করে ফেল। ভোগ তো করলে, আর কত? অবশ্য এ-সব জোর করে হয় না। আন্তরিক প্রার্থনা কর, চেষ্টা কর; তিনি ক্রমে তোমার দেহ মন সব পবিত্র করে দেবেন।

বেলুড় মঠ

৩০ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৩৭—১৫ জুলাই, ১৯৩০

আজ সকাল হইতেই মঠে বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম—যেন ছোটখাট একটি উৎসব। মহাপুরুষজীর নিকট দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং দীক্ষার্থীদেরও ভিড়। তিনিও অক্লান্তভাবে সকলকে উপদেশাদিদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। বিকালবেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় সেবক মহাপুরুষজীকে বলিল—মহারাজ, য—আপনাকে দর্শন করতে আসতে চান। আপনার দর্শনের জন্য তাঁর মন খুবই অশান্ত হয়েছে, তাই অনুমতি ভিক্ষা করে ফোন করেছিলেন।

মহাপুরুষজী—ঐ তো সেদিন এসেছিল—অনেক কথাবার্তা হলো। এরই মধ্যে আবার

কি অশান্তি এল তার মনে? খালি ঝুড়িঝুড়ি উপদেশ শুনে গেলে কি হবে? সে-সব ধারণা করা চাই—উপদেশমত কাজ করা চাই। নইলে, বাবা, কিছুই হবে না। কেবল বলবে—'মনে ভারী অশান্তি।' অথচ যেমনটি বলব তেমনটি করবে না। এই করে কি অশান্তি যায়? শাস্ত্রে তো অনেক উপদেশ আছে। খালি শাস্ত্র পড়লে কি কিছু হয়? শাস্ত্রের উপদেশ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। ঠাকুর যেমন বলতেন—'পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নিংড়াও এক ফোঁটাও পড়বে না।' তেমনি সাধু-সঙ্গই কর, শাস্ত্রই পড়, সাধনা না করলে কিছুই হবে না। আর অত কাছে বসে কথা বলা—তাও আমার মোটেই ভাল লাগে না। সকলের নিঃশ্বাস সইতে পারিনে; অনেক সময় নেহাত জোর করে বসে থাকতে হয়। তাই তো যখন খুব অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন আমি এক এক সময় উঠে পড়ি। আর, বাবা, অত কথাও বলতে পারিনে। আমার মনের অবস্থাও তেমন নয়। নেহাত বলতে হয়, তাই বাধ্য হয়ে কথাবার্তা বলি। ওরা তো জানে না যে, এতে আমার কতটা মানসিক ক্লান্তি হয়। চুপচাপ বসে থাকতেই ভাল লাগে—আনন্দম্। অবশ্য তা বলে কাউকে কি আসতে নিষেধ করি? তা নয়। জানি ওরা হৃদয়বান, ভক্ত—তবে খুব ভাবপ্রবণ। মনে করে ঐ একটুতেই হয়ে গেল। অত সোজা কি? তার জন্য কত কাঠখড় পোড়াতে হয়! খালি বললেই তো হবে না। এর জন্য মনকে কত তৈরি করতে হয়! কত সংযম, কত সাধন-ভজন চাই! নিজের ভাবে দৃঢ় না হলে, ভাব পাকা না হলেই এদিক-ওদিক হয়। আসল কথা কি জান? ঠিক ঠিক ভালবাসা নেই, ভগবৎপ্রেম নেই। বুকফাটা তেষ্টা পেলে কি সারা জীবন জল বেছে বেড়াতে পারে? ঠাকুরকে পেয়েছে, তাঁর আশ্রয় নিয়েছে। তাতে হয় না, আবার আর একটি চাই! অনুরাগ নেই, নিষ্ঠা নেই। ঠাকুরকে নিয়ে নিজের ভাবে পড়ে থাক—ক্রমে সব হবে। তাই তো ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন—

"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ো নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।
পরম ধন সেই পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।।"

এইরকম ভাব নিয়ে লেগে থাকতে হয়। তিনি তো আত্মারাম—সকলের ভেতরেই রয়েছেন। অন্তরে বসে তিনিই সব জানিয়ে দেন। ব্যাকুল হয়ে চাইলেই তিনি পূর্ণ করে দেন। সকলের অভীষ্ট ফল দেবার মালিক তিনি। যে যা চাইবে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গফলই তিনি দেন। গুরুনির্দিষ্ট পথে ধীরভাবে চলে যেতে হয়। এ, বাবা, বড় কঠিন পথ। চাই নিষ্ঠা, চাই শ্রদ্ধা আর অদম্য অধ্যবসায়। যেমন এক জায়গায় খানিকটা খুঁড়ে জল পেলে না বলে আর এক জায়গায় খুঁড়তে লেগে গেল, সেখানেও জল পেলে না বলে আর এক জায়গায় খুঁড়তে শুরু করল—এইভাবে সারা জীবন তার মাটি-খোঁড়াই সার হবে,

জল সে কখনো পাবে না। তেমনি যে সাধক একই সাধনমার্গে লেগে থাকতে না পারে, তার কখনো ভগবানলাভ হয় না।

আমি তো ওর সম্বন্ধে সব শুনেছি, তাই দুঃখ হয়। কি অব্যবস্থিতচিত্ত! depth (গভীরতা) নেই মোটেই, সবই ভাসা-ভাসা। নিজের ভাবে দৃঢ় না হয়ে অত পাঁচ জায়গায় যাতায়াত, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল নয়। তাতে নিজের ভাব নষ্ট হয়ে যায়। 'হাঁ, জী হাঁ জী করতে রহ বৈঠে আপন ঠাম (২।৩ বার বলিলেন)।' 'আপন ধাম' ঠাকুর বলতেন—আপনার ভাব। আপন ভাবে পাকা হয়ে—নিজের ভাব দৃঢ় করে নিতে হয়। আবার সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। আরে বাবা! ঠাকুরের নামেই তোমার আনন্দ হবে, তাঁর নামে সব পাবে—ভাব, সমাধি সব। কিন্তু সবই সময়সাপেক্ষ, তারপর তুমি গৃহস্থ মানুষ—নিজের কর্তব্য কর্মও তো আছে। হাঁ, মাঝে মাঝে হয়তো কোথাও গেলে। নির্জনবাস খুবই ভাল—ঠাকুর বলতেন। কিন্তু তা না হলেই কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না—সে কি কথা? একজনের কথা কায়মনোবাক্যে মানতে হয়। সেইজন্যই তো শাস্ত্রে গুরুকরণের উপদেশ রয়েছে। সদ্‌গুরু রাস্তা বাতলে দেন—ঠিক রাস্তা ধরিয়ে দেন।

ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পুনরায় মহাপুরুষজী বলিতেছেন ঃ

ধর্ম ওরা কি বোঝে? অমন অনেক ভাবসমাধি আমরা দেখেছি। ও-সব ঠাকুরের ভাব নয়। ও-সব লোকদেখানো ভাব—ওতে বরং অনিষ্ট হয়। ঠাকুর বলতেন—ধ্যান করবে মনে কোণে আর বনে। যারা নিম্ন অধিকারি তারা একটুতেই বলে বেড়ায়, পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ায়। ঐ রকম সব বাহ্যিক expression (অভিব্যক্তি) কেন দেখায়? ওতে এই বেশ বোঝা যায় যে, নিজের ভাবে এখনো দৃঢ় হয়নি—পাকা হয়নি। ছটফট করলে কি হয়? সাধন-ভজনে ডুব মারতে হয়—নিজের ভেতর ভাব জমাতে হয়। অন্যের ভাব-ভক্তি দেখে সাময়িক কতকটা উচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতা আসে, কিন্তু সকলকেই অনেক খাটতে হয়েছে—ধৈর্য ধরে অনেক সাধনভজন করতে হয়েছে, তবে তো পেয়েছে ভগবানের কৃপা। আন্তরিক হলে তিনি কৃপা করবেনই। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই। তিনি সমদর্শী। যে চায়, সে-ই তাঁকে পায়। ভগবানের দয়া সকলের উপরই আছে। তিনি তো দয়া করবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন। ব্যাকুল হয়ে চাইলেই পাবে। চাইবে না, কিছু করবে না, খালি ছটফটানি, খালি হা-হুতাশ—আমার কিছু হলো না, আমার কিছু হলো না! একদিনেই তো হয় না! introspection (আত্মবিশ্লেষণ) চাই। ঐটুকু আর regular practice (নিয়মিত অভ্যাস)। সাধন-ভজন থাকলে আর ভাবনা নেই—শান্তি অবশ্যই পাবে। করে তো দেখুক কি করে শান্তি না পায়। তাকে বলে দিও যে, এখন আমার কাছে আসবার কোন দরকার নেই। যা যা বলবার আমি সেদিনই সব বলে দিয়েছি। এখন শান্তি চায় তো কাজ করুক।

সেবকের কেবলই মনে হইতেছিল যে, আহা! মহাপুরুষজী প্রত্যেক ভক্তের কল্যাণের জন্য কত ভাবেন! কত গভীরভাবে চিন্তা করেন!

বেলুড় মঠ

২০ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭—৫ অগস্ট, ১৯৩০

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার দরুন মিশনের পক্ষ হইতে অভাবগ্রস্তদের সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রে আবেদন করা হইয়াছে অর্থের জন্য। সকালবেলা অনেকেই মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়াছেন। এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে, relief-এর (সেবাকার্যের) জন্য টাকাপয়সা আসছে?

সন্ন্যাসী—না, মহারাজ, তেমন কিছুই আসছে না।

মহারাজ—তা আসবে ক্রমে ক্রমে। তোমরা টাকার জন্য ভেবো না। তাঁর কাজ, তিনিই টাকার যোগাড় করে দেবেন।

সন্ন্যাসী—আর একটা মুশকিল যে, এ-সব কাজে নিজেদের স্থির রাখা খুবই কঠিন। কি অমানুষিক অত্যাচার না করেছে পাষণ্ডেরা!

মহারাজ—তা তো বটেই। তবে, বাবা, আমাদের কাজ হচ্ছে সেবা করা, আর সেই সেবা দ্বারা নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করা। স্বামীজী যেমন বলেছেন, 'by doing good to others we do good to ourselves'—অপরের ভাল করে আমরা নিজেদেরই কল্যাণ করি। অন্যের উপকার করে নিজেদের কল্যাণ করা—এই তো আমাদের সেবার উদ্দেশ্য। এ-সব কাজের ভেতরই নিজেকে পরীক্ষা করা যায়। বাইরের যত রকম বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন, তোমরা অবিচলিতভাবে তাঁর কাজ করে যাবে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।'—নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হলো তোমাদের জীবনের আদর্শ। তোমাদের দৃষ্টি সব সময় উঁচু দিকে থাকবে। তোমাদের আদর্শও যেমন মহান, হৃদয়ও তেমনি খুব বিশাল হবে। আর এই যে-সব communal (সাম্প্রদায়িক) মারামারি বিবাদ হচ্ছে, এর পশ্চাতে আমি তো দেখছি সেই সর্বকল্যাণময়ী মহামায়ার হাত। তাঁরই শুভ ইচ্ছাতে এই-সব হচ্ছে, আর এর ফল ভালই হবে। এতে হিন্দুদের ভেতর একতার সৃষ্টি হবে, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শিখবে। পরস্পরের জন্য feel (সমবেদনা) করতে শিখবে। আর এ-সবের খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। হিন্দুদের সব চাইতে বড় দরকার সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া—নিজেদের মধ্যে একতা আনা। বাইরের pressure (চাপ) না আসলে কি এত দিনের জড়তা, নীচতা কাটে? তোমরা বিশ্বাস করে যাও যে, এ-সব মায়ের ইচ্ছাতেই

হচ্ছে—এতে হিন্দুজাতির কল্যাণই হবে। সমগ্র জাতির ভেতর নবজাগরণ আসবে। ঠাকুর-স্বামীজী যখন এ জাতির ভেতর জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন হিন্দুদের সর্ব বিষয়ে খুব উন্নতি হবেই।

বিকালবেলা প্রায় ৫টার সময় প—মহারাজ কলিকাতা হইতে আসিয়া বলিলেন—মহারাজ, relief-এর (সেবাকাজের) জন্য একজন ভদ্রলোক ৫০০.০০ টাকা দিয়েছেন, আরো দরকার হলে দেবেন বলেছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া মহাপুরুষজী খুবই আনন্দিত হইলেন এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে বলিলেন—জয় মা। তাঁর লীলা কে বুঝবে? এই তিনিই একরূপে কষ্ট দিয়েছেন, আবার তিনিই অন্যরূপে লোকদের মনে সেই দুঃখ-মোচনের ভাব দিয়েছেন। 'যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।'—যে দেবী সকল প্রাণীর মধ্যে দয়ারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, বারংবার নমস্কার। এক হাতে সংহার করছেন, অন্য হাতে দিচ্ছেন বর ও অভয়। স্বামীজী বলতেন, 'কালীমূর্তিই ভগবানের perfect manifestation (শ্রেষ্ঠ বিকাশ)।' সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সবের কর্তাই তিনি। একদিকে অসির দ্বারা ধ্বংস করছেন, আর একদিকে বর ও অভয় দিচ্ছেন! এই হলো ভগবানের লীলা। একরূপে তিনি এত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন—অনাহারে, রোগে, শোকে মারছেন। অন্যরূপে তিনিই বহু লোকের প্রাণে সেই দুঃখমোচনের প্রেরণা দিচ্ছেন। ধন্য, মা, তুমি। তোমার লীলা কে বুঝবে? এ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। সৃষ্টির আদি হতে আরম্ভ করে এ যাবৎ কোন যোগী ঋষি কেউ তাঁকে জানতে পারেনি। অনন্ত লীলাময়ী মা।

'কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে।।'

তাই ঠাকুর বলতেন, 'মা, আমি তোমাকে জানতে চাইনে। তোমাকে কে জানবে? কেউ কখনো জানতে পারেনি, পারবেও না। তবে এই করো, মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমায় মুগ্ধ করো না, আর কৃপা করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস দাও।' (করজোড়ে) মা, আমাদের ভক্তি বিশ্বাস দাও, ভক্তি বিশ্বাস দাও।

বেলুড় মঠ

২১ শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩৭—৬ অগস্ট, ১৯৩০

সকালে মঠের সাধুরা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার ঘরে সমবেত হইতেছেন। স্বামী বিজয়ানন্দ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা

করিলেন—কি হে, আজকাল তোমাদের কি পড়া হচ্ছে?

স্বামী বিজয়ানন্দ—শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়া হচ্ছে।

মহারাজ—ভাগবতের কোন্ অংশ?

স্বামী বিজয়ানন্দ—অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথা পড়া হচ্ছে। অনঙ্গই পড়ে, আমি বসে শুনি। কখনো বা ও পড়ে এসে আমাদের কাছে গল্প করে বলে। ওর চাড়েতেই আমারও পড়া হচ্ছে। ও-ই জোর করে বলেছে বৈষ্ণব Philosophy (দর্শন) পড়তে, তাই পড়ছি।

মহারাজ—আমাদেরও এ রকম খুব হতো স্বামীজীর সঙ্গে। তিনি তো এক এক সময় এক এক ভাবে থাকতেন, আর আমাদের সকলকেও সেইভাবে উত্তেজিত করতেন। কখন জ্ঞানের চর্চা, কখন ভক্তির চর্চা, এ-সব হতো। এমন সময় গেছে যখন মাসাধিক কাল একই ভাবে সকলে মাতোয়ারা হয়ে থাকতুম। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ সেই একই ভাবে। খেতে, শুতে, বসতে সব সময়েই সেই এক আলোচনা ও বিচার চলত এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই ভাবের সাধনাও করতুম। স্বামীজী বুদ্ধদেবের ভাব খুব ভালবাসতেন, আর Buddhist Philosophy-ও (বৌদ্ধদর্শন) খুব পড়েছিলেন। তিনি তো আর একঘেয়ে ছিলেন না। তখন থেকেই স্বামীজীর ভাব, ভাষা, যুক্তি, তর্ক সবই এক অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি সাধারণ যা কথাবার্তা বলতেন, তাও খুব উঁচু ভাব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায়। তিনি মিল্‌টনের ভাষা খুব পছন্দ করতেন। বিচার বা তর্কাদি যখন করতেন মিল্‌টনের ভাষায় করতেন। স্বামীজী আমেরিকায় যাওয়ার পূর্বে যখন ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পরিব্রাজক অবস্থায় বেড়াচ্ছিলেন, তখন একবার জুনাগড়ের দেওয়ানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দেওয়ান তো তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এতটা impressed (মুগ্ধ) হয়েছিলেন যে, স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'Swamiji, you have a very bright future before you'—স্বামীজী, আপনার ভবিষ্যৎ খুব গৌরবময় দেখছি। তাই হলো। স্বামীজী আমেরিকায় গিয়ে শিকাগো Parliament of Religions-এ (ধর্মমহাসম্মেলনে) যখন গেলেন, তখন প্রথমটা বেশ একটু nervous (বিচলিত) হয়ে পড়েছিলেন। তা তো হবারই কথা। অত বড় gathering (সভা), হাজার হাজার লোক একসঙ্গে, আর সব বাছা বাছা লোক—flowers of the society। কি যে বলবেন তা ভেবেই পাননি। কারণ তিনি তো কোন লেকচার তৈরি করে যাননি! ডক্টর ব্যারোজ তাঁকে উঠতে বলছেন, আর তিনি কেবল সময় নিচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর সেই শ্লোকটি মনে পড়ে গেল—

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।'

—যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয় এবং পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি। মনে পড়াও যা আর ভয়-টয় সব কেটে গেল, এবং ঠাকুরকে

মনে মনে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর যা হলো তা তো তোমরা পড়েছই। তাঁর মুখ দিয়ে এক নতুন বাণী জগৎ শুনতে পেলে। তাঁর বক্তৃতাই সব চাইতে ভাল হলো। বাবা, ঐশী শক্তির খেলা! আর ঠাকুরের direct instrument (সাক্ষাৎ যন্ত্রস্বরূপ) ছিলেন স্বামীজী। তাঁর সামনে বড় বড় সব পণ্ডিত বক্তা—যারা নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করবার জন্য সেজেগুজে এসেছিল, সব ম্লান হয়ে গেল। তাই দেখে সেখানকার লোকেরা পরে অনেক টাকা চাঁদা তুলে ডক্টর ব্যারোজকে ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে পাঠাল খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে। ব্যারোজ সাহেব এদেশে এসে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেওছিলেন, কিন্তু ফল তেমন কিছুই হলো না। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে সেই বেদান্তের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বক্তৃতাদি এদেশে আসতে লাগল। আমরা প্রথমটায় স্বামীজীর লেকচার পড়ে তো বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, তা স্বামীজীর বক্তৃতা। তাঁর সেই ভাষাই বা কোথায় আর সেই ভাবই বা কোথায়? সব বদলে গিছিল। সে এক নতুন ভাব ও ভাষা। আমেরিকায় যাওয়ার পূর্বে এদেশে যতদিন ছিলেন, ততদিন কথাবার্তা ইত্যাদিতে তাঁর জ্ঞানের ভাবই বেশি প্রকাশ পেত। আর ভাষাও ছিল খুব philosophical (দার্শনিক) ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু ওদেশে যে-সব বক্তৃতা দিলেন, ঐগুলির ভাষা যেমন সরল, ভাবও তেমনি সরস ও প্রেমপূর্ণ। স্বামীজী পরে এদেশে ফিরে এসে বলেছিলেন—'ওরে, ও-সব বক্তৃতা কি আমি দিয়েছি? আমার মুখ দিয়ে ঠাকুরই সব বলেছেন।' বাস্তবিকই তাই।

বেলুড় মঠ

২৬ শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৩৭—১১ অগস্ট, ১৯৩০

বিকালবেলা। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। মহাপুরুষজী নিজ ঘরের আরাম কেদারায় বসিয়া 'এশিয়া' নামক মাসিক পত্রে র‍্যোমাঁ রোল্যাঁ স্বামীজী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন। এমন সময় জনৈক সেবক একজন ভক্তকে প্রণাম করাইবার জন্য লইয়া আসিয়া বলিল—'ইনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কৃপাপ্রাপ্ত; আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।' ভক্তটি খুব ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ছল ছল নেত্রে উঠিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, বাবা, তুমি মার কৃপা পেয়েছ?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ।

মহারাজ—তুমি মহাভাগ্যবান যে মা-র কৃপা পেয়েছ। তোমার আর ভাবনা কি? তুমি তো মুক্ত হয়ে গিয়েছ। আমাদের মা কি সাধারণ মা? জগতের কল্যাণের জন্য,

জীবকে মুক্তি দিবার জন্য স্বয়ং জগজ্জননী এসেছিলেন লীলাদেহ ধারণ করে।

ভক্ত—আপনি একটু আশীর্বাদ করুন যাতে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস দৃঢ় থাকে।

মহারাজ—তাই হবে, বাবা, তাই হবে। একটু জপটপ কর তো? নিত্য একটু জপ, প্রার্থনা এ-সব করো।

ভক্ত—আমরা সংসারে জড়িয়ে পড়েছি। ঐ টাকাপয়সার চিন্তা এবং অন্য পাঁচ রকম ভাবনাতেই সময় কেটে যায়, ভগবানের নাম আর করি কই? আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে এ-সব প্রতিবন্ধক কেটে যায়।

মহারাজ—বাবা, সংসারের কাজ কি চব্বিশ ঘণ্টাই করবে? ভগবানের নাম কি একটু করবে না? যাই হোক যতক্ষণ পার রোজ নিয়মিতভাবে একটু করা চাই-ই—তা দশ মিনিটই হোক, কি পাঁচ মিনিটই হোক, এমন কি দু-চার মিনিটই হোক। নিত্য নিয়মিতভাবে করতেই হবে। তবে যেটুকু করবে, আন্তরিক করবে প্রাণ থেকে। তাতে কল্যাণ হবে—শান্তি পাবে। তুলসীদাস বলেছিলেন, 'এক ঘড়ী, আধী ঘড়ী, আধী হু মে আধ' ইত্যাদি। চাই, বাবা, আন্তরিকতা। মা অন্তর্যামিনী, তিনি তো সময় দেখেন না, তিনি দেখেন প্রাণ। তাঁর প্রতি তোমার প্রাণের টান কতটা আছে, তাই তিনি দেখবেন। খুব প্রাণভরে প্রার্থনা করবে, তা যে অবস্থায়ই থাক, 'মা, দয়া কর, দয়া কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-বিশ্বাস দাও।' ঠাকুর বলতেন যে গৃহস্থদের ডাক ভগবান বড় শোনেন। সংসারীরা একটু ডাকলেই তিনি কৃপা করেন, কারণ তিনি তো অন্তর্যামী। তিনি বেশ জানেন এদের ঘাড়ে কত বোঝা চাপানো রয়েছে। একটুতেই সংসারীদের উপর তাঁর দয়া হয়। আহা! এদের মাথায় হাজার মণ বোঝা চাপানো রয়েছে। তা সরিয়েও তাঁকে দেখতে চাইছে। তাই অল্পেতেই তিনি গৃহীদের উপর প্রসন্ন হন। তাই বলছি, বাবা, যতক্ষণ পার একটু একটু রোজই ঠাকুরকে ডেকো।

ভক্ত—তা একটু একটু রোজই করি—খানিকক্ষণ জপ, ধ্যান, প্রার্থনা নিত্যই করে থাকি। কিন্তু তাতে তো তৃপ্তি হয় না। ইচ্ছা হয় আরো করি, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না।

মহারাজ—যা করছ, তাই করে যাও আন্তরিকতার সঙ্গে। তাতেই তোমার কল্যাণ হবে।

ভক্ত—আর একটিমাত্র কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনার শরীর অসুস্থ তাই বেশি কথা বলতে ভয় হচ্ছে।

মহারাজ—তা বল না, বেশ তো।

ভক্ত—মা ঠাকরুন যে মন্ত্র দিয়েছেন, সেই মন্ত্রই জপ করে যাচ্ছি। কিন্তু মন্ত্রের কি অর্থ তা তো জানিনে, আর তিনিও বলে দেননি।

মহারাজ—ঐ মন্ত্র জপ করছ তো? তবেই হলো। মন্ত্রের আবার অর্থ কি? মন্ত্র

হলো ভগবানের নাম। আর নামের সঙ্গে যে বীজ আছে, তা হলো সংক্ষেপে বিশেষ দেবদেবীর ভাবপ্রকাশ। বীজ এবং নাম একত্রেই হলো মন্ত্র। মোট কথা মন্ত্র ভগবানকেই বোঝাচ্ছে। মন্ত্র জপ করলে তাঁকেই ডাকা হয়। আর বেশি অর্থ জেনে কি হবে, বাবা? সরল বিশ্বাসে সেই মহামন্ত্র জপ করে যাও, তাতেই তোমার কল্যাণ হবে।

ভক্ত—আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে এ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

মহারাজ—খুব আশীর্বাদ করছি, বাবা, তাই হবে। মায়ের কৃপায় তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

বেলুড় মঠ

৩২ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৭—১৭ অগস্ট, ১৯৩০

আজ জন্মাষ্টমী। খুব সকাল হইতেই মহাপুরুষজী শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নাম বারংবার উচ্চারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' এই নাম মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তব পাঠ ও আবৃত্তি করিতেছেন। কখনো কখনো করিতেছেন নামগান। ক্রমে মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য আসিতেছেন এবং প্রণামান্তে কেহ কেহ ঘরেই দাঁড়াইয়া আছেন। নানা প্রকার কথাবার্তা হইতেছে। পরে ওঁকারানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতেছেন—আজ খুব দিন! হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই দিনে শ্রীভগবান জগতের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আজও কোটি কোটি নরনারী তাঁর নামে অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং শান্তি পাচ্ছে। যাঁরা ভগবদভক্ত, তাঁদের এরূপ বিশেষ দিনে খুব উদ্দীপন হয়ে থাকে। ঠাকুরকে দেখেছি, এ-সব দিনে তাঁর ভাবসমাধির কি বাড়াবাড়িই না হতো! তিনি নিজে চেষ্টা করেও সামলাতে পারতেন না। তাঁর মনের গতিই ছিল ঊর্ধ্বদিকে। নেহাত জোর করে নামিয়ে রাখতেন বই তো নয়! জগতের কল্যাণের জন্য মা তাঁর মন একটু আধটু নামিয়ে রাখতেন। আহা সে কি দৃশ্য! এত ভাব হতো যে, তখন আর কথাবার্তা বলতে পারতেন না। সে কি প্রেম, দরদর অশ্রু! এমন প্রেমাশ্রুপাত আর কারো কখনো দেখিনি! 'কথামৃতে' কোথাও কোথাও তার একটু আধটু বর্ণনা আছে। সে-অবস্থা কি বর্ণনা করা যায়? যে দেখেছে, সে-ই দেখেছে। ভাব, সমাধি—এ-সব তো তাঁর নিত্যকার ব্যাপার ছিল। মাস্টার মহাশয় তো আর রোজ যেতে পারতেন না। শনিবার, রবিবার, কি ছুটিছাটার দিনে তাঁর কাছে যেতেন বা তাঁর সঙ্গে অন্য কোথাও কোথাও দেখা হতো। তিনি নিজে যা যা দেখতেন শুনতেন, তা-ই লিখে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।

৫ পৌষ, ১৩৩৭, রবিবার—২১ ডিসেম্বর, ১৯৩০

আগামীকল্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি। মঠের কয়েকজন ত্যাগী যুবকের ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হইবে। ঐ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—স্বাধ্যায় খুব ভাল। শাস্ত্রাদি পাঠ সাধনারই অঙ্গ। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে প্রথমটায় গীতাখানি বেশ ভাল করে পড়া দরকার। গীতার মতো কি আর গ্রন্থ আছে? বড়ই সুন্দর। ওতে সব ভাবই রয়েছে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ। আমার ঐটিই সব চাইতে ভাল লাগে যে, স্বয়ং ভগবান তাঁর ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' আহা! কত বড় আশ্বাসের কথা! প্রাণ ভরে যায়! তিনি বড় আশ্রিতবৎসল। যে কায়মনোবাক্যে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছে, তার আর কোন ভাবনা নেই, তিনি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। আহা, কত কৃপা! কিন্তু কি মহামায়ার মায়া যে, মানুষ তাঁর এহেন কৃপা বুঝতে পারে না। যত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান হোক না কেন, তাঁর কৃপাকটাক্ষ ছাড়া এ মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। তিনি দয়া করে মায়ার আবরণ একটু সরিয়ে দিলে তবেই জীব তাঁর কৃপা বুঝতে পারে।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।'*

আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, কাইজার—এরা সব কত বড় বীর, জগৎটাকে যেন চুরমার করে দিতে পারত! জাগতিক হিসাবে এরা অবশ্য খুবই শক্তিমান পুরুষ; কিন্তু এ সৃষ্টিপ্রবাহ—যা অনাদি কাল থেকে চলছে, তাতে এরা সামান্য একটি বুদবুদ মাত্র। ঐ শক্তি দ্বারা এ মহামায়ার ফাঁদ কাটতে পারে না। আর যতক্ষণ তা না হলো, সবই বৃথা—মানবজন্মই ব্যর্থ হলো। সেখানে চাই ভগবৎকৃপা। আর সেই ভগবৎকৃপালাভের গুহ্য উপায়ও ভগবান নিজেই বলে দিচ্ছেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৯।৩৪
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।' ১৮।৬৬

—তুমি মদগতচিত্ত, আমার ভক্ত ও আমার পূজনশীল হও। আমাকেই নমস্কার কর। তা

* এই আত্মাকে বহুল বেদপাঠসহায়ে, কিংবা ধারণাশক্তি-সহায়ে, কিংবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যাঁহাকে আত্মা অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই সকাশে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।—কঠ উপ।

হলে আমার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হবে। সমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। শোক করো না।

জনৈক ভক্ত দীক্ষা-প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন—আমার দীক্ষায় লুকানো কিছু নেই। আমি জানি যে, যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিলেই মুক্তি। যে তাঁর শরণাপন্ন হবে, তিনি তাকে উদ্ধার করবেন নিশ্চয়। এ যুগধর্ম। ঠাকুর বলেছিলেন যে, বাদশাহী আমলের টাকা এ যুগে চলে না। রামকৃষ্ণ নামই এ যুগের মন্ত্র। দীক্ষা আর কি? ঠাকুরই দীক্ষা। আমি, বাবা, তান্ত্রিক দীক্ষা বা ভটচায্যি দীক্ষা জানিনে। তাঁর নামজপ কর দেখি! আর খুব প্রার্থনা কর—'হে প্রভু, আমায় দয়া কর।' আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই। ঠাকুর নিজে বলেছেন—'যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ রূপে এসেছেন।' এ, বাবা, স্বয়ং ভগবানের কথা—যুগাবতারের বাণী। আমরাও বলছি তাই। এ যুগে ঠাকুরের নাম নিলেই মুক্তি। এ অন্ধ বিশ্বাসটি নিয়ে থাকতে পার তো এস—যা জানি প্রাণ খুলে শেখাব; নইলে যাও যুক্তিতর্ক কর গে; পরে সময় হলে আসবে। এ গোঁড়ামি নয়—এ প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা জানি যে, ঠাকুরই স্বয়ং সনাতন পরব্রহ্ম। এ বিশ্বাস থাকা চাই। তুমি ভাল ছেলে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান; যথেষ্ট উৎসাহ আছে, পড়াশুনা করেছ অনেক; আরো কর আর সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির কর; প্রাণে অনুরাগ জাগাও, ব্যাকুলতা বাড়াও, খুব তাঁকে ডাক। দেখবে সময়ে সব হয়ে যাবে। মন তৈরি কর। তিনি বলতেন—'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।' তাই বলছি, আগে হৃদয়-পদ্ম বিকশিত করবার চেষ্টা কর, গুরুকৃপা আপনি এসে যাবে তখন। তিনি তো অন্তর্যামী—তোমার হৃদয়েই তিনি রয়েছেন তোমার অন্তরাত্মারূপে। সময় হলেই তিনি সব জানিয়ে দেবেন।

সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল। এত দিন এই-সব তো করলে। এখন আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা কর দেখি। এই হলো জীবনের সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা—ভগবানকে জানা। উঠে পড়ে লাগ। খুব তেজের সঙ্গে মনের সমস্ত শক্তি ঐ দিকে চালিত কর—প্রকৃত জীবনলাভের জন্য।

ভক্তটি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হওয়ায় মহাপুরুষজী তাহাকে দীক্ষাদান করিতে সম্মত হইলেন।

বেলুড় মঠ

৬ পৌষ, ১৩৩৭, সোমবার—২২ ডিসেম্বর, ১৯৩০

আজ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি। ভোর হইতেই মহাপুরুষ মহারাজের মুখে মা,

মা রব; যেন মাতৃগতপ্রাণ একটি শিশু! করজোড়ে চক্ষু মুদিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—মা, মা, মহামায়া, জয় মা, জয় মা। মা, আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, পূর্ণ জ্ঞান, বৈরাগ্য, অনুরাগ, ধ্যান-সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সঙ্ঘের কল্যাণ করুন, সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতে শান্তিবিধান করুন। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—আমাদের ভক্তি নেই, তাই এ-সব দিনের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে। আজ কি যে-সে দিন? মহামায়ার জন্মদিন। জীব-জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষলীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে? কী সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! কী চাপা! ঠিক যেন ছদ্মবেশে থাকতেন। আমরা তাঁকে কতটুকু বুঝেছি? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন। তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন—'ঐ যে মন্দিরের মা, আর এই নহবতের মা—অভেদ।' আর বুঝেছিলেন স্বামীজী। আহা! মা-ঠাকরুনের উপর কী গভীর ভক্তিই না তাঁর ছিল! তিনি বলেছিলেন যে, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্রপারে গিয়ে জগৎ জয় করে এসেছেন।

যত সাধু-ভক্ত প্রণাম করিতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—তুমি মাকে দেখেছ?

রবিবার বলিয়া ভক্তসংখ্যা একটু বেশি হইয়াছিল। প্রায় তিন হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া পরিতোষপূর্বক প্রসাদ পাইয়াছিলেন। সকালবেলা বেশ মেঘ করাতে সকলেরই ভয় হইয়াছিল বুঝিবা বৃষ্টি হইয়া মায়ের উৎসবের আনন্দে ব্যাঘাত হয়। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী মেঘের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করাতে মহাপুরুষজী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—না, কোন ভয় নেই। মায়ের কৃপায় আজকের দিন ভালই যাবে। তিনি মঙ্গলময়ী, সব মঙ্গলই করবেন।

বিকালবেলা পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মায়ের উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষজী ভারী খুশি। মায়ের মন্দিরে চণ্ডীর গান হইতেছিল। মঠে এই প্রথম চণ্ডীর গান। মহাপুরুষজী বারংবার চণ্ডীর গান কেমন হইতেছিল, সেই খোঁজ লইতেছিলেন, পরে বলিলেন—আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনিই কৃপা করে জ্ঞান দেন। জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে জানা; এই জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি হওয়া সম্ভব। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক জিনিস। মায়ের কৃপা হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার মালিক।

বেলুড় মঠ

৭ ফাল্গুন, ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার—১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথি। সারাদিন পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, ভোগরাগ ও প্রসাদ-বিতরণাদিতে সমগ্র মঠ আনন্দমুখরিত। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী মঠে সমবেত হইয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

মহাপুরুষজী সকাল হইতেই "জয় রামকৃষ্ণ, জয় প্রভু, জয় ভগবান—আজ বড় শুভদিন। তিনি স্বয়ং অহৈতুকী কৃপাতে এই ধরাধামে এসেছিলেন। এমনটি আর হয়নি। সমস্ত পৃথিবী তাঁর দয়ায় বেঁচে গেল। না, এমনটি আর হয়নি" ইত্যাদি নানা প্রকার ভাবোক্তি আপন মনেই করিতেছিলেন। অগণিত ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেছে, তিনিও অক্লান্তভাবে সকলকে ভাবস্থ হইয়া আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছেন। আর কেবলই প্রার্থনা করিতেছেন—যে যেখানে আছে, সকলের কল্যাণ হোক, প্রভু, সকলের কল্যাণ কর, সঙ্ঘের কল্যাণ কর, সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ কর।—বহু দীক্ষার্থীকেও তিনি কৃপা করিলেন।

দ্বিপ্রহরে আহারের সময় সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের প্রসাদাদি আনিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষজীর আজ আর আহারাদিতে মোটেই মন নাই। 'জয় গুরুদেব, জয় প্রভু' বলিয়া সামান্য একটু প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া মুখে দিয়া বলিলেন—যা, এ-সব নিয়ে যা। আজ আবার খাব কি? আজ এ-সব খাবারের কোন প্রয়োজন নেই। ঠাকুর এসেছেন আজ। আজ যে কী দিন তা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজ কি যেমন তেমন দিন? সমস্ত জীবজগতের, অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আজ এসেছিলেন। এমন কখনো হয়? যিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গরূপে এসেছিলেন, তিনিই আবার শত শত বৎসর পরে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ওঃ, আমি আর ভাবতে পাচ্ছিনে। আজ কত বড় দিন! আহা! ঠাকুরের জন্মতিথিদিনে তাঁর কথা বলতে বলতে আমার বাক্য, দেহ ও মন শুদ্ধ হয়ে গেছে। যদি আজ এ দেহ চলে যায়, সে তো মহা আনন্দের কথা। এই ঠাকুরের স্থানে এত সাধু-ভক্তের কাছে তাঁর কথা বলতে বলতে তাঁর তিথিপূজার দিনে দেহত্যাগ করা তো মহা সৌভাগ্যের কথা।

বিকালবেলাও বহু ভক্তের ভিড়। যাঁহারাই আসিতেছেন, সকলেই মহাপুরুষজীকে ভাববিহ্বল দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। আর তাঁহার পূত আশীর্বাণীতে প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা অনুভব করিয়া পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরিয়া যাইতেছেন। —রানী ও রাজা প্রভৃতি প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া বাহিরে যাইবার পরেই তিনি বলিলেন—কে রাজা, কে রানী? আমি ও-সব বুঝিনে। এক নারায়ণই সত্য,

এক তিনিই আছেন। ঠাকুরই সব। জীবজগতের কল্যাণের জন্য তিনি এসেছেন। এ বার্তা-প্রচারের জন্যই তো এ দেহটা এখনো আছে। নইলে কেন থাকবে? আমার তো আর কোন কামনা বাসনা নেই। যতদিন এ দেহ আছে, তাঁর বাণী প্রচার করব—এই জীবনের একমাত্র ব্রত। যতদিন তাঁর কাজ থাকবে, ততদিন এ দেহ থাকবে।

দুইজন আমেরিকান মহিলা-ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মহাপুরুষজী ইংরেজীতে বলিলেন—আজ আমি খুব চমৎকার আছি। আহা! সারা পৃথিবী আজ আনন্দমগ্ন। এই দিনে প্রভু জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমার ভেতরে যে কি রকম অনুভূতি হচ্ছে, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে পাচ্ছিনে। আজ কী শুভদিন! এত বড় বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি আগে কখনো পৃথিবীতে আসেনি। সমগ্র জগৎ তরে যাবে। ঠাকুর কে ছিলেন এবং জগৎকে কি দিয়ে গেলেন, তা বুঝতে এখনো শত শত বৎসর লাগবে।

রাত্রে মা-কালীর পূজা হইবে। পূজায় বসিবার পূর্বে পূজারী মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করাতে তিনি বলিলেন—বেশ, খুব ভক্তির সঙ্গে মায়ের পুজো করো, বাবা। আজ মায়ের বিশেষ আবির্ভাব। এই মায়ের শক্তিতেই তো সব। এ যুগে ঠাকুরের ভেতর দিয়েই তাঁর শক্তি খেলা করছে। ঠাকুর তো আর কেউ নন—সেই মা-কালীই ঠাকুররূপে জগতে এসেছিলেন। যখন তাঁর কথা ভাবি তখন এক একবার মনে হয়, বাবা, কার কাছে ছিলুম! স্বয়ং ভগবান, সাক্ষাৎ জগজ্জননী! আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। যারা ঠাকুরকে দেখেনি, কিন্তু আমাদের দেখেছে, তাদেরও কল্যাণ হবে। আমরা তো ঠাকুরেরই অংশ।

বেলুড় মঠ

৮ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৩৭—২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও উৎসবাদি খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাল সারা দিনরাতই মহাপুরুষ মহারাজের ভিতর যে ভগবদ্ভাবের আতিশয্য দেখা গিয়াছিল, আজও তাহা অনেকটা রহিয়াছে। মহামায়ার পূজার্চনা, পাঠ ও ভজনাদিতে সারা রাত সমগ্র মঠ মুখরিত ছিল। রাত্রিশেষে পূজান্তে হোম হয়। সেই হোমাগ্নিতে পরে বিরজা-হোম ও ব্রহ্মচর্য-হোম হয়েছিল এবং মহাপুরুষজী সাতজন ব্রহ্মচারীকে পবিত্র সন্ন্যাসধর্মে ও তিনজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। যদিও কাল সারা দিনরাত তাঁহার খুবই পরিশ্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মোটেই ক্লান্ত মনে হয় না। প্রাণের দিব্য আনন্দচ্ছটায় তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত।

সকালে পূর্বরাত্রির পূজার সব রকম প্রসাদাদি তাঁহার সামনে আনা হইল। তিনি

খুব ভক্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে সেই মহাপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া সব প্রসাদই অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া জিহ্বাতে ঠেকাইলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—মা করুণাময়ী, মা মা, জগতের কল্যাণ কর, মা, মা। তাঁহার সেই সকরুণ প্রার্থনার ধ্বনি উপস্থিত সকলের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিল।

পরে নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করিতে আসিয়াছে। কাহার কি নাম হইয়াছে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রত্যেকেরই নাম শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে হঠাৎ একেবারে গম্ভীরভাবে বলিলেন—নাম রূপ এ-সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য—দুদিনের; এ-সব কিছুই নয়। নাম ও রূপের পারে যেতে হবে, সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে, আত্মবস্তু লাভ করতে হবে। সন্ন্যাসের অর্থ-তো তাই। বিরজা হোম করে, শিখাসূত্র ত্যাগ করে গেরুয়া পরা ও সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ। সে তো প্রবর্তক সন্ন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। 'মহাবাক্য' নিত্য ধ্যান করো। যাও, বাবা, এখন খুব ধ্যান লাগাও। আত্মবস্তু অনুভব কর। তবেই ঠাকুরের সঙ্ঘে আসা, সন্ন্যাস নেওয়া—এ-সব সার্থক হবে। আমার কথা শুনতে চাও তো এই।

নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদ প্রার্থনা করাতে তিনি প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমরা ত্যাগীশ্বর ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছ—দেহ, মন, প্রাণ সব তাঁর চরণে অর্পণ করেছ। তোমরা আমাদের পরম প্রিয়। আমি খুব প্রার্থনা করছি তোমাদের ভগবানে ভক্তি, বিশ্বাস অচল অটল হোক। প্রভুর নামে যে গৈরিক ধারণ করেছ, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই গৈরিকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রভুর সেবা করে যাও। তিনি কল্পতরু; তাঁর কাছে খুব প্রেম ভক্তি চাইবে, ব্রহ্মবিদ্যা চাইবে। তিনি সব দেবেন, পরিপূর্ণ করে দেবেন। তোমাদের অদেয় তাঁর কিছুই নেই। দেবীসূক্তে আছে—

'অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মানং
তমৃষিং তং সুমেধাম্।।'*

দেব ও মনুষ্য কর্তৃক প্রার্থিত সেই ব্রহ্মতত্ত্ব তিনি নিজেই কৃপাপরবশ হয়ে উপদেশ করছেন। আর যাকে যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি কৃপাকটাক্ষে ব্রহ্মা, ঋষি ইত্যাদি করে দেন। তিনি তো কৃপা করবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন; চাইলে দেন।

অতঃপর তিনি এই শ্লোকটি বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।**

---

* দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রার্থিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমি নিজেই বলছি। যাকে যাকে আমি রক্ষা করতে ইচ্ছা করি, তাকে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে থাকি। কাকেও ব্রহ্মা, কাকেও ঋষি, কাকেও বা প্রাজ্ঞ ও মেধাবী করি।

** হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী-স্ত্রী, এমন কি সর্বজ্ঞত্বও কামনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।—শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক।

পরে সন্ন্যাসীরা কোথায় মাধুকরী করিতে যাইবে ইত্যাদি দু-চার কথার পরে বলিতেছেন—গেরুয়া পরলে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখায়। বাইরের গেরুয়াই সব নয়; বাবা, ভেতরটা রাঙিয়ে নিতে পারলে তবেই হবে। সে-ই আসল জিনিস।

বেলা প্রায় ১১টার সময় জনৈক সেবককে বলিতেছেন—ওঃ, কাল কত বড় দিন গেল! যেমন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ, কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেব, নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ, তেমনি তো এ যুগে ঠাকুর এসেছেন। একটা ক্ষণমাহাত্ম্য মানতে হয়। আহা! ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বর্ণনাদি কেমন চমৎকার রয়েছে! সব মধুময়, আনন্দময়। দিগ্‌সকল, আকাশ, পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ, বৃক্ষলতা, গুল্ম সবই মঙ্গলময়। চারিদিক শান্ত। কি সুন্দর বর্ণনা!

ইহা বলিতে বলিতে সেবককে ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত পড়িতে আদেশ করিলেন।

বেলুড় মঠ

১৩৩৭-৩৮—১৯৩১

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর এত দুর্বল যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের খাট হইতে নিচে নামিতেও কষ্ট হয়। রাত্রে প্রায়ই ঘুম হয় না। সেজন্য রাত্রেও সেবকগণ পালা করিয়া কেহ না কেহ সর্বক্ষণ তাঁহার কাছে থাকেন। তিনি সমস্ত রাতই ভগবদভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; কখন নিকটস্থ সেবককে কথামৃত, গীতা, উপনিষদ্ বা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের কোন নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করিতে বলেন এবং শ্রবণ করেন তন্ময় হইয়া। আবার কখন বা চুপচাপ—ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন কিংবা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট করজোড়ে কাতর প্রার্থনা করেন সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য। আহা, সে কী অবেগপূর্ণ ভাষা! কখন বা দেবদেবীর ছবি বুকে ধরিয়া শুইয়া থাকেন। সর্বক্ষণই এক দিব্যভাবে মাতোয়ারা। সেবক যদি কখন জিজ্ঞাসা করে—মহারাজ, একটু ঘুমুবেন না? তখন বলেন—আমার আবার ঘুম কি রে? এবং সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গাহিতে থাকেন ঃ

> 'ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
> এবার যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমের ঘুম পাড়িয়েছি।।
> এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, ভাল ভাবীর কাছে
> ভাব শিখেছি।
> যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
> আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।'

একবার ঘুমের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই সেই নিদ্রারূপিণী—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা'। তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে

রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা' সেই মা-ই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। মা আমার হৃদয়-কন্দর আলোকিত করে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাঁকে দর্শন করলেই সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর কোন দরকারই বোধ হয় না। যখনই একটু শ্রান্তি বোধ করি, তখনই মাকে দেখে নেই। ব্যস, আনন্দম্। সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

রাত্রি প্রায় তিনটা। চারদিক নিস্তব্ধ। সমগ্র জগৎ ঘুমন্ত শিশুর মতন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে। সমগ্র মঠও যেন গভীরধ্যানমগ্ন। মহাপুরুষজীর ঘরে একটি ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল। তিনি পার্শ্বস্থ সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দেখ, গভীর রাতে খুব জপ করবে। ঐ হলো জপধ্যানের খুব প্রশস্ত সময়। জপ করতে বসলে হয়তো ঘুম পাবে, কিন্তু তবু জপ ছেড়ো না। পরে দেখবে জপ করতে করতে একটু তন্দ্রার মতো এলেও সে সময়ও ভেতরে জপ ঠিক চলবে। সোজা হয়ে যাতে বসতে পার তেমনিভাবে আসন করো। কখনো যদি বেশি ঘুম পায় তো আসন ছেড়ে উঠে পড়বে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে জপ করবে। 'হাতে কাজ মুখে হরিনাম' অর্থাৎ চলতে ফিরতে, কাজকর্ম করতে করতে, সব সময়ই মনে মনে জপ করে যাবে। এইভাবে কিছুকাল জপ করে যাও; তখন দেখবে যে, মনের একটা অংশ সর্বক্ষণ জপে লেগে থাকবে—একটা অন্তঃপ্রবাহী স্রোতের মতো সর্বাবস্থায় জপ চলবে। খুব খেটে রোখ করে দু-তিন বছর যদি দিনে-রাতে সমানে জপ চালাতে পার তো তখন দেখবে যে, সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। চণ্ডীতে 'মহারাত্রি'র কথা আছে জান তো? ঐ মহারাত্রিই হলো সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট সময়। তখন একটা আধ্যাত্মিক ভাবধারা বইতে থাকে। মন যত সূক্ষ্ম হবে, তত ঐ ধারার প্রভাব বুঝতে পারবে। সাধু রাত্রে বেশি ঘুমুবে কেন? দু-এক ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হলো। সারারাত যদি ঘুমিয়ে কাটাবে তো জপধ্যান করবে কখন? মহানিশায় সমগ্র প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে। তখন অল্পায়াসেই মন স্থির হয়ে যায়। হৃদয়ে উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা সহজেই আসে।

সেবক অতি ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আমার তো জপধ্যানে তেমন মন বসে না। জপ করতে বসলেই দেখি যে, যত বাজে চিন্তা এসে মনকে তোলপাড় করে তোলে। আপনার সেবার সঙ্গে সঙ্গে ও অন্য কাজকর্মের ভেতর বরং ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, মন শান্তভাব ধারণ করে এবং তাতে আনন্দও পাই। কিন্তু যখনই জপ-ধ্যান করতে বসি তখনই মন যেন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এইভাবে মনের সঙ্গে লড়াই করে করে, একটা মহা অশান্তি ভোগ করে শ্রান্ত হয়ে উঠে পড়তে হয়। এ ভাবটা আগে ছিল না। এখন কিছু কাল যাবৎ—বিশেষত যত দিন থেকে আপনার সেবা করতে আরম্ভ করেছি, ততদিন থেকেই মনের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

সেবকের মনের অশান্ত অবস্থার কথা শুনিয়া মহাপুরুষজী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; পরে ধীরভাবে বলিলেন—হাঁ, কোন কোন মনের ঐ রকম বিদ্রোহী ভাব থাকে।

সে মনকেও বশে আনবার উপায় আছে। সে রকম অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যান-জপ করবার জন্য আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে। ঠাকুর হলেন জীবন্ত সমাধিস্বরূপ। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে। বলবে—'প্রভু, আমার মন স্থির করে দাও, আমার মন শান্ত করে দাও।' এইভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা করে ঠাকুরের সমাধির কথা ভাববে। তাঁর যে ছবি দেখছ, এ ছবি খুব উচ্চ সমাধি-অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন মর্ম বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও। মন হলো তোমার, তুমি মন হতে স্বতন্ত্র, আত্মস্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মতো বসে মনের গতিবিধি লক্ষ্য করে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর দেখবে, মন আপনা হতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন মনকে ধরে এনে ঠাকুরের ধ্যানে লাগাবে। যতবার মন পালিয়ে যাবে, ততবারই মনকে ধরে নিয়ে আসবে। এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে শান্ত হয়ে যাবে। তখন খুব প্রেমের সঙ্গে ভগবানের নাম জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে। কিছুদিন ঠিক যেমন বললুম তেমনি করে যাও দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিতভাবে এটি করে যেতে হবে।

সেবক—আমার তো মনের যা অবস্থা দেখছি, তাতে সাধন-ভজন কিছু হবে বলে মনে হয় না। ভরসা কেবল আপনার আশীর্বাদ।

মহাপুরুষজী সস্নেহে বলিলেন—বাবা, আশীর্বাদ তো খুবই আছে। তোমরা সব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবনসর্বস্ব করেছ; তোমাদের উপর আশীর্বাদ থাকবে না তো কার উপর থাকবে? কিন্তু তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন—'কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' ঐ পালতোলাই হলো নিজের চেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই—বিশেষ করে সৎ কাজের জন্য, সাধন-ভজনের জন্য। আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি আছে, ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ মা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছ কেন? না, ভগবান লাভ করবে বলে। আর পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ; বিশেষ করে আমাদের কাছে থাকার সুযোগও ঠাকুর করে দিয়েছেন। এত সব সুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর আনবে। তাঁর পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ; একটু জোর ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এ-সব তো মহামায়ার বিভীষিকা। এ-সব দেখিয়ে তিনি সাধকদের পরীক্ষা করেন। ও-সবে যখন সাধকের মন বিচলিত না

হয়, সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন মহামায়া প্রসন্না হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হলো। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।'* বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি? স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া 'মারের' রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আসনে বসে সংকল্প করলেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।।'

অর্থাৎ এই আসনেই আমার শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক অস্থি মাংস সব ধ্বংস হোক, কিন্তু বহুকল্পদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করে এ আসন থেকে আমার শরীর বিচলিত হবে না। কী দৃঢ় সংকল্প! শেষটা মা প্রসন্না হয়ে নির্বাণের দ্বার উন্মোচন করে দিলেন এবং বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করে ধন্য হলেন। ঠাকুরের জীবনেও তাই হয়েছিল। তাই বলছি, বাবা, খুব চেষ্টা কর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধন-ভজনে লেগে যাও। মন বসছে না বলে জপধ্যান ছেড়ে দিলে চলবে কেন? দেখ না আমাদের জীবনই। ঠাকুরের ছেলেদের প্রত্যেকের জীবনই কঠোর সাধনার জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। মহারাজ, হরি মহারাজ, যোগেন মহারাজ—এঁরা সকলে কত কঠোর তপস্যাই না করেছেন! অথচ সাক্ষাৎ যুগাবতার ঠাকুরের অজস্র কৃপালাভ করেছিলেন তাঁরা। তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই সকলের ব্রহ্মজ্ঞান করিয়ে দিতে পারতেন। স্পর্শমাত্র সমাধিস্থ করে দিতেন, কিন্তু তবু তিনি আমাদের কত কঠোর সাধনা করিয়ে নিয়েছেন! ভগবৎকৃপা হলে সাধনের পথও সুগম হয়, বাধা-বিঘ্ন সব দূর হয়ে যায়। ভগবান দেখেন প্রাণ, তিনি দেখেন আন্তরিকতা। ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকলেই তিনি দেখা দেন। এই যে তিনি দয়া করে দেখা দেন, এইটিই তাঁর কৃপা। তিনি তো স্বাধীন, স্বতন্ত্র। তিনি কি আর সাধন-ভজনের বশ যে, এত জপ করলে, এত ধ্যান করলে, এত কঠোরতা করলে তিনি এসে দর্শন দেবেন? তা নয়। তবে সাধন মানে হলো একমাত্র তাঁকেই চাওয়া—জগৎ-সংসার ছেড়ে, মান-যশ দেহসুখ এমন কি নিজের অস্তিত্বও ভুলে গিয়ে, ইহকাল পরকাল সব ভুলে গিয়ে একমাত্র তাঁকেই চাওয়া। যে এমনিভাবে ভগবানকে পেতে চাইবে, তাকে তিনি কৃপা করে দর্শন দেবেন। তিনি অশেষ কৃপা করে দর্শন দেন বলেই জীব তাঁকে দেখতে পায়; এই হলো তাঁর কৃপা। তিনি যদি দয়া করে দর্শন না দিতেন, তা হলে জীবের সাধ্য কি যে, তাঁর দর্শন পায়? তিনি যেমন ভক্তবৎসল, তেমনি কৃপাসিন্ধু।

সেবক—একমাত্র ভরসা আছে যে, আপনাদের আশ্রয় পেয়েছি। যাতে ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়, আপনারা তাই করবেন। একবার যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আর ত্যাগ করবেন না।

মহাপুরুষজী—ঠাকুর বড় আশ্রিতবৎসল; তিনি শরণাগত-পালক। তিনি একবার যার

---

* এই মহামায়াই প্রসন্না হয়ে মনুষ্যদিগকে মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন।

হাত ধরেছেন, তার এ ভবসমুদ্রে ডুবে যাবার আর কোন ভয় নেই। চণ্ডীতে আছে—'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।' অর্থাৎ তোমার আশ্রিত মানবগণের বিপদ থাকে না; তোমাকে যারা আশ্রয় করবে, তারা সকলেরই আশ্রয়স্বরূপ হয়। কায়মনোবাক্যে ঠাকুরকে ধরে থাক; তিনি ভববন্ধন মুক্ত করে দেবেন ঠাকুরের চরণে যারা অনন্যশরণ হয়েছে, যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাদের মুক্তির ভাবনা নেই। মুক্তি তাদের হয়ে যাবে। সে ভার আমাদের উপর—আমরা তা বুঝে নেব শেষ সময়ে ঠাকুর সকলকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়। কিন্তু শুধু মুক্তিলাভ করার জন্যই যে সাধন-ভজনের প্রয়োজন, তা নয়। সাধন-ভজন করে, এই দেহেতেই ভগবান লাভ করে জীবন্মুক্ত হয়ে থাক। খুব তাঁকে ডাক, প্রাণভরে তাঁর নাম কর, তাঁর ভাবে ডুবে যাও, জীবন্মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবে। তাছাড়া স্বামীজী যে-সঙ্ঘ গঠন করেছেন তারও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যারা ঠাকুরের এই সঙ্ঘে স্থান পেয়েছে, তাদের প্রত্যেকের উপর স্বামীজী ন্যস্ত করে গেছেন বিরাট দায়িত্ব। প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে ত্যাগ ও তপস্যাময় এমন আদর্শ জীবন গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রত্যেকের জীবন ঠাকুরের পবিত্র সাত্ত্বিক ভাব-প্রচারের উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, যাতে সমগ্র জগৎ তাঁর পবিত্র সঙ্ঘকে দেখে—এমন কি তাঁর সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গের ভেতর দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে পারে। স্বামীজী বলেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থাং জগদ্ধিতায় চ।' তা এ জগতের ঠিক ঠিক হিত তখনই হবে, যখন সমগ্র জগতে ঠাকুরের উদার সার্বভৌম ভাব প্রচারিত হবে। আর সে-কাজের ভার ন্যস্ত করে গেছেন তিনি সমগ্র সঙ্ঘের উপর।

বেলুড় মঠ

২৫ মাঘ, সোমবার, ১৩৩৮—৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

আজ রাজা মহারাজের জন্মতিথি। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়াই মহারাজকে প্রণাম করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে "জয় রাজা মহারাজ কী জয়" বলিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি হওয়ার পর ঠাকুরঘরে ঊষাভজন হইতেছে। আজ সোমবার, তাই শিবের গান গাওয়া হইতেছিল। কিন্তু মহারাজের জন্মতিথি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান গাহিবার কথা মহাপুরুষজী বলিয়া পাঠাইলেন, তদনুসারে 'জাগো মোহন প্যারে' ইত্যাদি গান হইতেছে। সর্বশেষে 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী' গানটি গাওয়া হইল। গান শুনিয়া মহাপুরুষজীর ভারী আনন্দ।

ক্রমে সকাল হইল। মহাপুরুষজীর ঘরে লোকসমাগম বাড়িতেছে। মঠের সাধুবৃন্দ ও ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইতেছেন। তিনিও সকলের সঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা বলিতেছেন। বলিলেন—আজ খুব দিন, মহারাজের জন্মতিথি। এঁরা হলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ

বহুকাল পরে পরে এরকম উচ্চ আধ্যাত্মিক-অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ সংসারে আসেন জগতের হিতের জন্য। সমগ্র পৃথিবী তাঁদের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে যায়। তিনি কি কম আধার? তিনি হলেন ঈশ্বরকোটি, শ্রীভগবানের পার্ষদ, ঠাকুরের মানসপুত্র।

ঠাকুরের কাছে শুনেছি যে, রাখাল মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসার কয়েক দিন পূর্বে ঠাকুর একদিন বসে আছেন, এমন সময় মা (জগন্মাতা) হঠাৎ একটি শিশু তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'এই তোর ছেলে।' ঠাকুর তো তাই দেখে ভয়ে শিউরে উঠলেন। মাকে বললেন—'আমার আবার ছেলে কি? আমি তো সন্ন্যাসী।' তাতে মা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এ সাংসারিক ছেলে নয়, এ হলো ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তার পরেই যখন রাখাল মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে এলেন, ঠাকুর তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। মহারাজও প্রথম থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করতে লাগলেন—ঠিক যেন একটি পাঁচ বছরের বালক। কত রকম আবদার করতেন, মান অভিমান করতেন! কখনো বা ঠাকুরের কোলে-পিঠে চেপে বসতেন। আরো কত কি! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! ও-সব হলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার। লৌকিক দৃষ্টিতে বা লৌকিক বুদ্ধিতে ও-সবের কিছুই বোঝা যায় না।

একটু বেলা হইলে মহারাজের মন্দিরে তাঁহার প্রিয় বিবিধ দ্রব্য ভোগ দেওয়া হইল। মহাপুরুষজী সেই প্রসাদ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ভক্তিপূর্বক একটু একটু গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—মহারাজ নিজে নানারকম খেতে ভালবাসতেন আর সকলকে খাওয়াতেও ভালবাসতেন। আহা, তিনি যখন মঠে আসতেন, তখন যেন আনন্দের মেলা—কত লোকজন! সাধু-ভক্তদের নিয়ে ধ্যানজপ, পূজাপাঠ, ভজনকীর্তন, রঙ্গরস, খাওয়া-দাওয়া নিত্য চলেছে—যেন আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে এক দিনই গেছে! মহারাজের মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষেই লোককে এমন নানাভাবে আনন্দ দেওয়া সম্ভব।

কথা কহিতে কহিতে মহাপুরুষজী মহারাজের একখানি ছবি দেখিতে চাহিলেন। ছবি দেওয়া হইলে তিনি উহা মাথায় স্পর্শ করিয়া বুকে ধারণ করিলেন। পরে একদৃষ্টে সেই ছবির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—দেখ দেখ, কেমন রাজার মতো চেহারা! কি রকম চোখ-মুখ! বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় যেন ঠিক রাজা। তাই তো স্বামীজী তাঁকে 'রাজা' বলে ডাকতেন। 'এই রাজা', 'রাজাকে দে', 'রাজাকে ডাক', 'রাজাকে বল', 'রাজার মঠ' ইত্যাদি বলতেন। স্বামীজীই এই নাম রাখেন। মহারাজেরই তো এই মঠ; আমরা আবার কে? স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত এ মঠের জন্য তিনি কত করেছেন, কত খেটেছেন! প্রত্যেক ইটখানিতে মহারাজের স্মৃতি যেন জড়িত। তিনিই তো বুকের রক্ত জল করে এ-সব করেছেন। এখনো তিনি সব করছেন। আমি তো তাঁর চাকর—তাঁর পাদুকা মাথায় করে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করেছিলেন, আমিও তেমনি মহারাজের পাদুকা মাথায় করে তাঁর কাজ চালাচ্ছি। তিনি যেমন বুদ্ধি দেন, তেমনি করছি। আহা, স্বামীজীর কি শ্রদ্ধা-ভালবাসাই না ছিল মহারাজের ওপর! ঠিক 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—এই ভাব।

একটু থামিয়া আবার সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—মহারাজ কে বল তো? তিনি ব্রজের রাখাল। ঠাকুর বলতেন যে, শেষ সময় তাঁর আসল স্বরূপ কি, সেই-সব দর্শন হবে। ঠাকুর যা বলেছিলেন, হয়েছিলও তাই। শেষ সময়ে মহারাজ নানারকম দর্শনের কথা বলতে লাগলেন, 'আমি ব্রজের রাখাল, আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। আহা, তোদের চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছিসনে—আমার কমলে কৃষ্ণ!' ইত্যাদি। এ-সব দর্শনাদির কথা যখন তিনি বলতে লাগলেন, তখনই আমরা বুঝলুম—এবার আর নয়, মহারাজের শরীর আর থাকবে না।

মহাপুরুষজী যেন আজ মহারাজের ভাবে একেবারে বিভোর! পুনরায় বলিতেছেন—কি তপস্যাই না মহারাজ করেছেন! ঐ তো ঠাকুরের আদরের রাখাল, কিন্তু কি কঠোরতাই না তিনি করেছেন! তাঁদের সব কাজই লোকশিক্ষার জন্য। একবার হরি মহারাজ ও তিনি একসঙ্গে তপস্যা করছেন। দুজনে আছেন পাশাপাশি কুটিয়ায়, কিন্তু এমন জোর তপস্যা চালিয়েছেন যে, পরস্পরের কথাবার্তা নেই। দেখাশুনা হচ্ছে কখনো কখনো, কিন্তু দুজনেই নিজের ভাবে এমন মশগুল হয়ে আছেন যে, কথাবার্তা বলার মতন মনের অবস্থা কারো নয়। অনেক দিন পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে কোন কথাবার্তা হতো না। অথচ দুজনে এত ভাব!

বেলুড় মঠ

৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮—১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

ব্রাহ্মমুহূর্ত। নীরব নিস্পন্দ প্রকৃতির মাঝে সমগ্র জগৎ যেন ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে। প্রশান্ত অম্বরতলে মন্দিরগুলি ধ্যানমৌন। অদূরে পূতসলিলা ভাগীরথী ধীরপ্রবাহে বহিয়া যাইতেছে। মৃদুমন্দ পবন। মঠে ঊষার অস্পষ্টতায় সন্ন্যাসিগণ ধীরপদবিক্ষেপে নীরবে স্ব স্ব ধ্যানাদিতে যাইতেছেন। সকলেই অন্তর্মুখ। মহাপুরুষ মহারাজও নিজ শয্যায় বহুক্ষণ উঠিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মন কোন আনন্দলোকে বিচরণ করিতেছে কে জানে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ঊষার মঙ্গলকরস্পর্শে পূর্বাকাশ রক্তিমাভ ও ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। বিহগকুল যেন ঈশগুণ-গান আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দিরে মঙ্গলশঙ্খ মঙ্গলারাত্রিকের আহ্বান জানাইয়া দিল। মঙ্গলারতির পর ঠাকুরঘরে ঊষাভজন আরম্ভ হইয়াছে। আজ সোমবার, তাই মহাদেবের ভজন হইতেছে। জনৈক সাধু শিবভক্ত দেবীসহায়-রচিত এবং মহাপুরুষ মহারাজের বিশেষ প্রিয় দুইটি গান—'গঙ্গাধর মহাদেব শুন ফুকার মেরী' এবং 'অব শিব পার করো মেরী নেইয়া' গাহিয়া সর্বশেষে 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর'—এই গানটি গাহিলেন। গানের মধুর সুরে সমগ্র মঠ ছাইয়া গিয়াছে। গান শুনিতে শুনিতে মহাপুরুষজী গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন—স্পন্দহীন, নির্নিমেষ।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু মহাপুরুষজীর মন তখনও যেন শিবানন্দসাগরে ডুবিয়া আছে। কখন অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "ওঁ নমঃ শিবায়" বা "হরি ওঁ তৎ সৎ"। আবার কখনও বা "বম্ বম্ মহাদেব" ধ্বনি করিতেছেন। এতক্ষণে মঠের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারীই মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হইয়াছেন। তিনিও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া অল্প অল্প কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গিরিশবাবু-রচিত শেষোক্ত গানটির সম্বন্ধেই কথা হইতেছে। মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা, গিরিশবাবু কি গানই বেঁধেছেন! এই বলিয়া গানটি সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন। তারপর বলিতেছেন—ঠাকুরের দয়া না হলে এমনটি হয় না। এ যেন সাক্ষাৎ শিবদর্শন করতে করতে গান লিখেছেন। কি সুন্দর, গম্ভীর ভাব! 'কাল বদ্ধ বর্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম পানে'—এ গভীর ধ্যানের অবস্থা। ধ্যান খুব গাঢ় হলে তখন আর অতীত বা ভবিষ্যতের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, একমাত্র বর্তমানেরই বোধ থাকে—তাও অস্পষ্ট। তাই বলেছেন, 'কাল বদ্ধ বর্তমানে'—অতীত বা ভবিষ্যতের বোধ তখন নেই, একমাত্র বর্তমানই প্রতিভাত হচ্ছে। অবশ্য মন যখন সমাধিতে লীন হয়ে যায়, তখন বর্তমানেরও কোন জ্ঞান থাকে না, তখন ত্রিকালাতীত অবস্থা। সে-অবস্থার বর্ণনা করা যায় না। তাই স্বামীজী বলেছেন, 'অবাঙ্মনসোগোচরম্—বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। এ সাধারণ অবস্থার কথা নয়। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে সমাধির আনন্দ প্রকাশ করবার ভাষা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠাকুরকে দেখেছি, তিনি নির্বিকল্প সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হওয়ার সময় মন যখন একটু নেমেছে, অথচ বেশ ভাবাবেশ রয়েছে, তখন সে-অবস্থা বর্ণনা করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু পারতেন না। শেষটায় বলতেন, 'আমার তো ইচ্ছে হয় যে তোদের বলি, কিন্তু পারিনে, কে যেন মুখ চেপে ধরে!' বাস্তবিকই সে-অবস্থার বর্ণনা করা যায় না। 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

প্রত্যুষে যে-সাধুটি ঠাকুরঘরে ভজন করিতেছিলেন, তিনি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—দেখ, যখনই ঠাকুরের সামনে শিবের গান গাইবে, তখনই শেষটাতে দু-একটা মায়ের গান যেন অবশ্য গাওয়া হয়। যে কোন দেবীবিষয়ক একটি দুটি গান গেয়ে তবে ভজন শেষ করবে, এইটে বিশেষ করে মনে রেখো। তোমরা তো জান না, তাই বলে দিচ্ছি। আর ঠাকুরকেই গান শোনাচ্ছ, তিনি গান শুনছেন, এই ভাব নিয়ে গান গাইবে। ঠাকুর ক্রমাগত শিবের গান শুনতে পারতেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে একজন বড় গায়ক ঠাকুরকে গান শোনাবেন বলে এসেছিলেন। বেশ ওস্তাদ লোক, চমৎকার গাইতেন। গায়ক প্রথম থেকেই শিববিষয়ক গান গাইতে শুরু করে দিলেন। ঠাকুর তো দু-একটি গান শোনার পরই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন—একেবারে নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরকে এমনভাবে সমাধিস্থ হতে ইতিপূর্বে আর দেখিনি। তাঁর মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে, আর থম থম করছে। শরীর আরো যেন বড় হয়ে গিয়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। সে যে কি দৃশ্য তা আর কি বলব! এইভাবে বহুক্ষণ কেটে গেল, সমাধি আর ভঙ্গ হয় না। ওদিকে গানও চলেছে, সকলেই একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত। ঠাকুরের এমন গভীর সমাধি এবং ঐ রকম মূর্তি বড় একটা দেখা যেত

না। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ 'উঃ উঃ' করে উঠলেন। ভেতরে যেন অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করছেন। অতি কষ্টে বললেন, 'শক্তি গা'। আমরা বুঝলুম যে, শক্তিবিষয়ক গান গাইতে ইঙ্গিত করছেন; তখনই গায়ককে মায়ের গান গাইতে বলা হলো, মায়ের গান গাওয়া হতে লাগল। তখন ধীরে ধীরে ঠাকুরের মন সহজ অবস্থায় নেমে এল। পরে তিনি বলেছিলেন যে, সেদিন তাঁর মন খুব গভীর সমাধিতে ডুবে গিয়েছিল, কিছুতেই মন নামাতে পারছিলেন না। ঠাকুর বেশিক্ষণ নির্বিকল্প অবস্থায় থাকতে চাইতেন না। তিনি এসেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। কিন্তু নির্বিকল্প অবস্থায় থাকলে তো আর জগতের কাজ করা সম্ভব নয়; তাই তিনি ভক্তসঙ্গে ভক্তিভাব আশ্রয় করে থাকতে চাইতেন। শিবের ধ্যান হলো নির্বিকল্প অবস্থা—সেখানে এ সৃষ্টি নেই, জীবজগৎ নেই। ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গতিই ছিল নির্বিকল্পের দিকে। তাই তিনি ছোটখাট বাসনা রেখে মনকে নামিয়ে রাখতেন। তাঁর সবই অদ্ভুত!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহাপুরুষজী জনৈক সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ তো সোমবার, আমাদের শিবমহিম্নঃ-স্তোত্রপাঠ হয় না? কখন হবে?

এখনই হবে, মহারাজ—এই বলিয়া সেবক নিকটস্থ টেবিলের উপর হইতে একখানি স্তবের বই লইয়া উহা হইতে মহিম্নঃ-স্তোত্র সুর করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপুরুষজী করজোড়ে বসিয়া আছেন—চক্ষু মুদ্রিত। পাঠ চলিতেছে, মহাপুরুষজীও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন ঃ

''মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্না স্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ।।

*　　*

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো-
রতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্ববর্চীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ।।

*　　*

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।

*　　*

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্বায় চ নমঃ।।

*　　　*

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ।।

*　　　*

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।

*　　　*

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽপি মহেশ্বরঃ
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।।"*

---

* হে হর, তোমার মহিমার প্রকৃত স্বরূপ যাহারা জ্ঞাত নহে, তাহাদের স্তুতি যদি তোমার যোগ্য না হয়, তাহা হইলে তোমার সম্বন্ধে ব্রহ্মাদির স্তবসমূহও বিফল হইয়াছে; পক্ষান্তরে নিজ নিজ বুদ্ধির সামর্থ্য অনুযায়ী স্তব করিয়া সকলেই যদি অনিন্দনীয় হয়, তবে তোমার স্তবের জন্য আমার এ প্রচেষ্টাও নিন্দনীয় নহে।

বস্তুত তোমার মহিমা বাক্যমনগম্য সমস্ত বিষয়ের অতীত; বেদও যে মহিমা সম্বন্ধে সভয়ে তদ্ভিন্ন বস্তুর নেতি নেতি মুখে নির্দেশ করে, সেই মহিমা কাহার দ্বারা গীত হইবে? কেই বা তাঁহার গুণের সীমা করিবে, কাহারই বা তাহা জ্ঞানগম্য হইবে? কিন্তু তোমার সাকার রূপের প্রতি কাহার না মন ধাবিত হয়, কাহার বাক্য তোমার সে রূপপ্রকাশে না চেষ্টিত হয়?

বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মত প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রবিষয়ে 'ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং উহাই হিতকর'—এইরূপ বুদ্ধি আছে বলিয়াই লোকে নিজ নিজ রুচির বিভিন্নতা হেতু সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে, পরন্তু নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি নরগণের একমাত্র গতি তুমি।

হে প্রিয় দেব, (ভক্তের পক্ষে) নিকটতম তোমাকে নমস্কার, (অভক্তের পক্ষে) দূরতম তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর, (নির্গুণরূপে) সূক্ষ্মতম তোমাকে নমস্কার, (সগুণরূপে) বৃহত্তম তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়ন, অতি-বৃদ্ধ তোমাকে নমস্কার, তরুণতম তোমাকে নমস্কার। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্বরূপে বর্তমান আবার সর্বাতীতরূপে বর্তমান তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার।

বিশ্বসৃষ্টির জন্য রজোগুণের উৎকর্ষযুক্ত ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার। বিশ্ব-সংহারের জন্য তমোগুণের উদ্রেকযুক্ত হররূপী তোমাকে নমস্কার। লোকপালনার্থে বিষ্ণুরূপী তোমাকে নমস্কার এবং ত্রিগুণাতীত-জ্যোতির্ময়পদ-প্রদাতা শিবরূপী, তোমাকে নমস্কার।

এই কয়েকটি শ্লোক মহাপুরুষ মহারাজ একটু জোরে জোরে আবৃত্তি করিলেন। ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ। তারপর মহাপুরুষজী আস্তে আস্তে বলিলেন—ঠাকুরকে দেখেছি তিনি শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র সবটা শুনতে পারতেন না। একটা দুটো শ্লোক শুনেই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। 'অসিতগিরিসমং স্যাৎ' আর 'তব তত্ত্বং ন জানামি'—এই দুটো শ্লোক তিনি নিজেই মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করতেন। 'তব তত্ত্বং ন জানামি' শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি কেঁদে ফেলতেন, আর কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'তোমার তত্ত্ব কে বুঝবে, প্রভু? তুমি যে কি তা কে জানে? আমি তোমায় জানতে চাইনে, তোমায় বুঝতে চাইনে, প্রভু। কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও।' তাঁকে কে জানবে?

অতঃপর ঐ শ্লোক দুইটির বঙ্গানুবাদ মহাপুরুষজীর নির্দেশানুসারে পাঠ করা হইল ঃ

'হে ঈশ্বর! নীলগিরিসম যদি মসী হয়, সমুদ্র যদি মস্যাধার হয়, কল্পতরুশাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি পত্র হয় এবং সরস্বতী যদি চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও তোমার মহিমা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না।'

'হে মহেশ্বর! তুমি কিরূপ আমি তোমার তত্ত্ব জানি না। হে মহাদেব! তুমি যেরূপ হও, আমি সেইরূপ তোমাকে নমস্কার করি।'

পরে মহাপুরুষজী বলিলেন—যোগীশ্বর শিব হলেন সন্ন্যাসীর আদি গুরু। তাই স্বামীজী ছেলেবেলা থেকেই শিবের ধ্যান করতে ভালবাসতেন। শিবের মতো সর্বত্যাগী না হলে মন কখনো সমাধিস্থ হয় না।

বেলুড় মঠ

মহাপুরুষ মহারাজ বিভিন্ন দিনে সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—সাধু উঠবে খুব সকালে। রাত তিন-চারটার পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার পর আর কখনো ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল সকাল স্নান করবে। স্নান করে ধ্যান ধারণাদি করবে। স্নান করেই খাবে না। স্নান করে, ধ্যানভজন না করে খাওয়া—সে তো অন্যান্য লোকেরা করে, সাধু তা করবে না। সাধুর চেহারা, কথাবার্তা সবই অন্যরূপ হবে—সরল, সুন্দর, দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাকবে? সাধু একদম নির্ভরশীল হবে—ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। ত্যাগের পথে যারা থাকবে, তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু রাত্রে বেশি খাবে না। ঠাকুর বলতেন—'রাত্রের খাওয়া হবে জলখাবার মতো।' সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চা করবে। সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সাধু মিষ্টভাষী ধীর স্থির হবে, ভদ্র ব্যবহার করবে। সাধু সর্বদাই কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাত থাকবে। কামিনী-কাঞ্চনের কোন সংসর্গ রাখবে না।

২০ ফাল্গুন, ১৩৩৮, শুক্রবার—৪ মার্চ, ১৯৩২

শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন মহাপুরুষ মহারাজ চিঠিপত্রাদি সব সময় নিজে পড়িতে পারেন না। বিকালবেলা জনৈক সেবক তাঁহাকে চিঠি পড়িয়া শোনাইতেছিলেন; তিনিও খুব নিবিষ্ট মনে সব শুনিতেছেন। একটি ভক্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণের বেদনা জানাইয়া লিখিয়াছেন—প্রাণে মহা-অশান্তি; সাধন-ভজন যথাসাধ্য করে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে শান্তি পাচ্ছি না। কি করলে প্রাণে শান্তি পাব, কি করলে তাঁর কৃপা হবে, তাঁর দর্শন পাব, দয়া করে জানাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার কৃপা হলেই ভগবৎকৃপা হবে এবং ধন্য হয়ে যাবে আমার এ মানবজীবন—ইত্যাদি। শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা! এরা আর্ত। এদের হবে। একটা উপায় আছে—বিশ্বাস। খুব বিশ্বাস যদি থাকে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর যুগাবতার, স্বয়ং ভগবান এবং তাঁরই এক সন্তান আমায় কৃপা করেছেন, তা হলে সব হয়ে যাবে। তাঁর অবতারত্বে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া চাই। তিনি তো গুরুরূপে আমার হৃদয়ে বসে ভক্তদের কৃপা করছেন। লিখে দাও—'খুব কাঁদ, বাবা, কাঁদ। কান্না ছাড়া অন্য উপায় জানিনে। প্রভু, আমায় কৃপা কর, দেখা দাও, দেখা দাও—বলে খুব কাঁদ। তাঁর জন্য যত কাঁদবে ততই তিনি তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। খুব প্রেমের সহিত কাঁদ, ব্যাকুল হয়ে কাঁদ।' ঠাকুরের কাছে শুনেছি—

'হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, জেনে বার্তা, ডাকি হে তোমারে।।
শুনি কড়ি নাই যার, তারেও কর পার,
আমি দীন ভিখারী নাইকো কড়ি,
তাই ডাকি হে তোমারে।।'

তিনি তো পারের কর্তা; তিনি যদি কৃপা করে এ ভবসিন্ধু পার না করেন, তা হলে জীবের সাধ্য কি যে পার হয়। ঠাকুর! তুমি অনন্ত, কত গভীর, তোমায় কে বুঝবে? তোমার ইতি কেউ করতে পারে না। তুমি দয়া কর। দয়া করে তোমার স্বরূপ একটু বুঝিয়ে দাও—তা হলেই জীবের ভববন্ধন চিরতরে ঘুচে যাবে।

একটি ভক্ত ষট্‌চক্রভেদ সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। মহাপুরুষজী বলিলেন—লিখে দাও, ও-সব জেনে কাজ নেই। খালি কাঁদ, খুব কাঁদ। সরল বালকের ন্যায় কাতরভাবে কাঁদ আর প্রার্থনা কর—'ঠাকুর, আমায় ভক্তি-বিশ্বাস দাও; মা, রক্ষা কর। তোমার এ মায়াপাশ থেকে মুক্ত কর।' আমি, বাপু, এইমাত্র জানি। মা মা বলে খুব কাঁদ, বাবা, কাঁদ, সরল বিশ্বাস নিয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক—আর কাঁদ, তিনি দয়া করবেনই। আমিও খুব প্রার্থনা করছি—খুব এগিয়ে যাও, ধর্মকর্মে খুব অগ্রসর হও। পরে সেবকের

দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি বলছ, কি গোলমাল আছে তার? আমি ও-সব কিছু জানিনে। অতীত জীবনে কে কি করেছে না করেছে, তা আমি জানতে চাইনে। যা গেছে তা চলে গেছে; এখন সে এখানে এসে পড়েছে, ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছে। সব কেটে যাবে, বেঁচে যাবে। ঠাকুর কপালমোচন। যুগাবতারের শরণাপন্ন হয়েছে—একি কম কথা? বহু সুকৃতি না থাকলে এটি হতো না। তিনি ঠিক উদ্ধার করবেন।

খানিক পরে জনৈক ভক্ত সেবার জন্য কিছু টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষজী ভক্তটিকে বলিলেন—টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তো কোন দরকার নেই। আমরা, বাবা, সাধুমানুষ; টাকা দিয়ে কি করব? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া করে 'দো রোটি' দিচ্ছেন. এই বলে গাইতে লাগলেন—

'প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।।
দো রোটি এক লঙ্গোটী তেরে পাস্ মৈ পায়া।
ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া।।
প্রভু মৈ গোলাম তেরা।।'

তা তিনি দয়া করে 'দো রোটি' তো দিচ্ছেনই। আর কি হবে টাকা-কড়িতে? নিয়ে যাও, বাবা, ঐ টাকা। তোমরা গৃহস্থ, তোমাদেরই টাকার দরকার। (ভক্তটি কাতরভাবে নেহাত পীড়াপীড়ি করায় সেবককে বলিলেন) ঐ টাকা ঠাকুরসেবায় দিও।

আবার চিঠিপড়া চলিতে লাগিল। একজন দীক্ষিত ভক্ত দীক্ষা নেবার পূর্বে জীবনে অনেক গর্হিত কাজ করিয়াছে, সেইজন্য খুবই অনুতপ্ত হইয়া জীবনের অনেক কথা জানাইয়া কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া লিখিয়াছে। চিঠি শুনিয়া মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—এর প্রাণে ঠিক ঠিক অনুতাপ এসেছে, এ অনুতপ্ত। এদেরই হবে। লিখে দাও—'ভয় নেই, ঠাকুর তোমায় উদ্ধার করবেন। তাঁর কাছে কোন পাপই খুব বড় নয়। তোমাদের ত্রাণ করবেন বলেই তো ঠাকুর এসেছিলেন। তিনি অন্তর্যামী; তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব জেনেই তিনি তোমায় কৃপা করেছেন। কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। এখন থেকে তিনি তোমার হাত ধরে রয়েছেন, আর তোমার পা বেচালে পড়তে দেবেন না। কোন ভয় নেই, বাবা। তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডেকে যাও, তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন। আর এই যে আমার কাছে তুমি সব দুষ্কৃতি স্বীকার করেছ, এতেই তোমার সব পাপক্ষয় হয়ে গেল; এখন হতে তুমি নিষ্পাপ, প্রভুর ভক্ত, তাঁর আশ্রিত ও শরণাগত। তাঁর কাছে খালি পবিত্রতা, ভক্তি, প্রেম চাইবে।'

পরে ভক্তি-ভক্তের কথায় মহাপুরুষজী বলিলেন—ঠাকুর বলতেন, 'ও বড় দুর্লভ জিনিস। শুদ্ধা ভক্তি জীবকোটির বড় একটা হয় না।' খুব ভাবের সহিত ঠাকুর গাইতেন—

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায়—হয়ে ত্রিলোকজয়ী।।
শুন চন্দ্রাবলী, ভক্তির কথা কই...
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপগোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতাজ্ঞানে তার বোঝা মাথায় বই।।'

আহা! ঠাকুর কি ভাবের সহিতই না এ গানটি গাইতেন! ইহা বলিয়া নিজেই গানটি গাহিতে লাগিলেন। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—ঠাকুর তো পাপী-তাপীদের উদ্ধার করবার জন্যই এসেছিলেন। আন্তরিকভাবে তাঁর শরণাগত হলে তিনি তাঁর কৃপাহস্ত বুলিয়ে সব পাপ মুছে দেন। তাঁর দিব্য স্পর্শে মানুষ তখনই নিষ্পাপ হয়ে যায়। চাই তাঁর উপর আন্তরিক টান, তাঁর চরণে আত্মনিবেদন। গিরিশবাবু তো কত কি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্তি দেখে ঠাকুর তাঁকে কৃপা করলেন, কোলে তুলে নিলেন। তাই তো শেষ জীবনে গিরিশবাবু বলতেন—'পাপ রাখবার অত বড় স্থান আছে জানলে আরো অনেক পাপ করে নিতাম।' তিনি কৃপাময়, কৃপাসিন্ধু।

জনৈক দীক্ষিতা স্ত্রী-ভক্ত স্বামীর সদ্য মৃত্যুতে শোকাতুরা হইয়া পাগলিনীর ন্যায় অনেক বিলাপ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। স্তব্ধ হইয়া সেই চিঠি শুনিতে শুনিতে মহাপুরুষজী মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন—আহা! আর শুনতে পারছিনে। চিঠি পড়া শেষ হইলে তিনি খানিকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন—মহামায়া লীলা করছেন আর মানুষ শোকতাপে কষ্ট পাচ্ছে। এ-সব ব্যাপার কে বুঝবে? মানুষ যদি একটু এই-সব ভাবে, সংসারের অনিত্যত্ব চিন্তা করে, তবেই বাঁচে। তারা দিনরাত মায়াতে ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে মৃত্যুচিন্তা করা ভাল। কত ভাবে যে এ জগতের নশ্বরত্ব চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবু তো জীবের চৈতন্য হয় না! এরই নাম মায়া।

ঠাকুর এ গানটি প্রায়ই ভক্তদের সামনে গাইতেন—ইহা বলিয়া খুবই কম্পিতকণ্ঠে যেন শোকে মুহ্যমান হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

"এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে।।
বিল ক'রে ঘুণি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে।।
গুটিপোকায় গুটি করে, পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি, আপনার জালে আপনি মরে।।"

মানুষ ঠিক গুটিপোকার মতো। নিজে মায়ার সংসার রচনা করে তাতে বদ্ধ হয়ে শোকতাপে জ্বলে পুড়ে মরছে। যাদের 'আমার আমার' করছে, তারা যে কেউ আমার নয়, তা বুঝবে না। একে তো দেহধারণ করাই কত কষ্টের ব্যাপার, তার উপর আবার

এই মায়ার সৃষ্টি! মানুষই বা কি করবে? মহামায়ার আবরণী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ভুগে মরছে। মহামায়ার ব্যাপার কিছুই বোঝবার জো নেই। তাঁর নাশিনী শক্তির খেলা। সেজন্য ঠাকুর বলতেন—'মা, তোমার লীলা কে বুঝবে? বুঝতেও চাইনে। কৃপা করে তোমার শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান দাও—এই প্রার্থনা।' অনেক সময় ঠাকুর এ-কথা বলতেন। আমি তো তাঁর কথাই বলছি। পড়ে গিয়ে ঠাকুরের যখন হাত ভেঙে যায়, তখন তো তাঁর বালকের মতো অবস্থা। একদিন একটি ছোট ছেলের মতো ধীরে ধীরে হাঁটছেন আর মাকে বলছেন—'মা, তোমায় তো আর দেহধারণ করতে হলো না! দেহধারণের কষ্ট তুমি তো বুঝলে না!'

মহাপুরুষজী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া 'আহা! আহা! সদ্য স্বামিশোক!'—ইহা বলিতে বলিতে ফুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন স্বামিহারার শোক আকর্ষণ করিয়া নিলেন নিজের ভিতর।

বেলুড় মঠ

৫ চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩৮—১৮ মার্চ, ১৯৩২

বিকালবেলা জনৈক সেবক চিঠিপত্রাদি সব পড়িয়া শোনাইতেছিলেন; ভুবনেশ্বরের এক চিঠিতে শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হরি মহান্তির দেহত্যাগের খবর আসিয়াছে। অদ্ভুত মৃত্যু! শরীরত্যাগের খানিক পূর্বে মহান্তি দেখিতে পাইল যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একটি সুন্দর ফুল হাতে করিয়া তাহাকে দিতে আসিয়াছেন। মহারাজজীকে দেখিয়াই মহান্তি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যহীনতার দরুন উঠিতে পারিল না। তখন পার্শ্বস্থিত একজনকে মহান্তি বলিল—মহারাজজীর হাত থেকে ফুলটি আমায় এনে দাও। কিন্তু মহারাজজীকে অন্য কেউ দেখিতে পাইতেছিল না। তখন মহান্তি বলিল—সে কি? ঐ যে মহারাজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফুল হাতে করে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?—ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাত জোড় করিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ঐ চিঠি শুনিয়া মহাপুরুষজী অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন—আহা! আহা! হরি মহান্তি মহারাজকে বড় ভক্তি করত, কত ভালবাসত! অতি চমৎকার লোক, বড় ভক্তিমান। মহারাজ তাকে খুব কৃপা করতেন; তাই তো শেষ সময়ে দর্শন দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মহারাজের কৃপা আর ঠাকুরের কৃপা তো একই। ঠাকুর যাদের কৃপা করেছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই, তাঁর সন্তানেরাও যাদের কৃপা করেছেন, তাদের মুক্তি নিশ্চিত। আর কিছু না হোক, শেষ সময়েও ঠাকুরের দর্শন পাবেই। ঠাকুর ঠিক তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন। স্বামীজী, মহারাজ—এঁরা কি কম গা?

যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে, তার মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প শোননি? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করে বলেছিল—'বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার গতি কি হবে?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন—'ভয় নেই, তোর হবে; মৃত্যুসময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বেই রসিক বলে উঠল—'এই যে, বাবা, এসেছ। বাবা, এসেছ!' এই বলতে বলতে মারা গেল।

ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত। বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য রকমের। তাঁর তো খুব কঠিন অসুখ; সকলেই মহা চিন্তিত। একদিন তিনি কেবলই বলতে লাগলেন—'কই, আমার ভাইরা কোথায়?' এ সংবাদ পেয়ে আমরা বাগবাজারে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। শেষের দিকে আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম, তাঁর সেবাদিও করতাম। দেহত্যাগের দু-তিন দিন আগে থেকে আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে কাছে আসতে দিতেন না; আমাদেরই কেবল দেখতে চাইতেন। যতটুকু কথাবার্তা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার একদিন আগে ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। দেহত্যাগের দিন আমরা তাঁর পাশেই বসে আছি; বলরামবাবুর স্ত্রীও শোকে খুব ম্রিয়মাণা হয়ে গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুর স্ত্রী আকাশের গায়ে একখণ্ড কাল মেঘের মতো দেখতে পেলেন। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নিচে নেমে আসতে লাগল এবং একটি রথের আকার ধারণ করে বলরাম-মন্দিরের ছাদের উপর নামল। ঐ রথের ভেতর থেকে ঠাকুর নেমে এসে বলরামবাবু যে ঘরে ছিলেন, সে দিকে গেলেন এবং খানিক পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এই vision (অলৌকিক দৃশ্য) দেখতে দেখতে বলরামবাবুর স্ত্রীর মন এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিল, যেখানে শোক-তাপ স্পর্শ করতে পারে না। যখন তাঁর চমক ভাঙল, তখন তিনি ঐ দর্শনের কথা গোলাপ-মাকে বললেন। গোলাপ-মা এসে আমাদের ঘটনাটি জানালেন; তার কিছুক্ষণ আগেই বলরামবাবুর দেহত্যাগ হয়েছিল। এমন সব অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে! আজকালও অনেক ভক্তদের অদ্ভুত দেহত্যাগের খবর পাওয়া যায়। দেহত্যাগ-সময়ে কত দিব্য-দর্শন ও অনুভূতি হচ্ছে! ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে! ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়।...

ইহার দুই দিন পরে অর্থাৎ ২০ মার্চ শনিবার রাত্রে ঠাকুরের পরম ভক্ত রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী* ঠাকুরের ছবি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার নাম

* ইনি ভক্তমণ্ডলীর নিকট নীরদ মহারাজের মা নামে পরিচিতা। ইনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্যা হইয়াছিলেন।

করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইয়া দেহত্যাগ করেন। সে খবর শুনিয়া মহাপুরুষজী অনেকক্ষণ খুবই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—এঁরা সব অসাধারণ লোক, ঠাকুরের লীলাসহচর, যুগে যুগে অবতারের লীলা পুষ্ট করবার জন্য অবতারের সঙ্গে দেহধারণ করেন। মা ঠাকরুন যখন বৃন্দাবনে তখন একদিন রাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করতে গিয়ে দেখেন যে, নীরদের মা রাধাকান্তজীকে চামর করছেন। পরে সঙ্গের মেয়ে ভক্তদের তিনি বলেছিলেন, 'আরতির সময় দেখলাম, নবগোপালবাবুর স্ত্রী ঠাকুরকে চামর করছে।' আহা! তাঁহার কি ভক্তি, কি প্রেমই ছিল ঠাকুরের ওপর! ঠিক গোপীদের ভাব! তাঁকে ছেলেরা বলেছিল—'মা, তুমি তো খুব ঠাকুর ঠাকুর করছ; এখন তোমার ঠাকুর আমাদের কি দৈন্যদশায়ই ফেলেছে! ঢের হয়েছে, আর ঠাকুর ঠাকুর করো না।' তাতে নীরদের মা বলেছিলেন—'বলিস কি রে? আমি যে তাঁকে ভালবেসেছি! আমি যে তাঁকে একবার প্রাণ দিয়েছি রে! তোরা আবার এ-সব কি বলিস রে!'

মহাপুরুষজী খুব আবেগভরে এ কথাটিই বার বার বলিতে লাগিলেন। আর আহা! আহা! করিতে লাগিলেন। পরে যেন রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—এঁরা 'অশুল্কদাসিকা', তাঁর ভালবাসায় কেনা। তাঁর চরণে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন! আহা! আমি যতই ঠাকুরের উপর তাঁর ভালবাসার কথা ভাবছি ততই আমার মনটা, বুকের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠছে! আত্মপ্রীতি কাম—কৃষ্ণপ্রীতি প্রেম। নীরদের মা একজনকে বলেছিলেন—'ভজন-সাধন কর; কিন্তু ঠিক ঠিক মরতে জানলেই সব হলো।' তা তিনি ঠিক ঠিক মরেছেন। ঠাকুরের ছবি বুকে করে তাঁর নাম করতে করতে ঠাকুরের কাছে চলে গেছেন।

বেলুড় মঠ

১৬ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৮—২৯ মার্চ, ১৯৩২

মহাপুরুষজীর শরীর কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ। অল্প অল্প জ্বর হইতেছে। এদিকে রক্তের চাপ অত্যধিক এবং হৃৎপিণ্ডেরও গোলমাল রহিয়াছে। শ্বাসকষ্টের জন্য অনেক সময় রাত্রেও শয়ন করিতে পারেন না। আহার সামান্য জলীয় পদার্থ। ডাক্তার অজিতনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে আছেন। ডাক্তারবাবু প্রায় রোজই আসিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ কিন্তু এ শারীরিক অসুস্থতা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছেন না। তিনি সদা প্রফুল্ল, সকলের সঙ্গেই আনন্দে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে দৈহিক কোন গ্লানি আছে বলিয়া মনে হয় না।

আজ সন্ধ্যার পর ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ সহাস্যবদনে তাঁহাকে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তারবাবু যথাযথ উত্তর দিয়া রোগের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। শরীরের উত্তাপ ১০০° ডিগ্রি, রক্তের চাপ ২৩০, এবং হৃৎপিণ্ড খুব

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পরে ডাক্তারবাবু মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছেন, মহারাজ?

মহারাজ—বেশ আছি। আমি তো যতক্ষণ ভগবানের স্মরণ-মনন, তাঁর নামগুণগান করতে পারি, ততক্ষণ বেশ থাকি।

ডাক্তারবাবু—কিন্তু বড় দুর্বল করে ফেলেছে যে!

মহারাজ—তা আমি কি করব? আর তোমরাই বা কি করবে বল? শরীর তো যাবেই—কোন শরীরই চিরকাল থাকে না। আমি জানি এ শরীর আমার নয়, এ শরীর মায়ের। তিনি যা ইচ্ছে করবেন, তাই হবে। রাখতে হয় রাখবেন—না রাখতে হয় শরীর যাবে, বুঝলে? এ দেহ থাকে তাও আমার ইচ্ছে নয়, আর যায় তাও আমার ইচ্ছে নয়। সব, বাবা, মায়ের ইচ্ছে। তাঁর যেমন ইচ্ছে তাই হবে। তোমরা যা করবার তা করে যাও, তাতে তো আমি কোন আপত্তি করছিনে। তবে আমি বেশ জানি যে, যা করবার মা-ই করবেন, তোমরা কিছুই করতে পারবে না। শরৎ মহারাজের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এ শরীরও চলে গেছে। তখন থেকেই আমার সমস্ত মন-প্রাণ একেবারে ঠাকুরের পাদপদ্মে লীন হয়ে গেছে। এ শরীর এখন যে আছে, তা কেবল নামে মাত্র। তাও কি করে যে রয়েছে এবং কেন যে আছে, তা ঠাকুরই জানেন।

দুই চারটি কথার পরে অজিতবাবু বলিলেন—মহারাজ, আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা যে, নীলরতনবাবুকে একবার নিয়ে আসি। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছি। টাকা-পয়সার কথা বলাতে তিনি যেন একটু দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মিশনের প্রেসিডেন্টের কাছে টাকা নেব? ছি ছি! বরং তাঁর সেবা করতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

মহারাজ—তিনি মহৎ লোক, তাই অমন বলেছেন। তা আসুন তিনি, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কথা হচ্ছে, কি হবে ভদ্রলোককে মিছামিছি কষ্ট দিয়ে! তিনি এমন busy (কর্মব্যস্ত) লোক যে, তাঁকে বিরক্ত করতে খুবই লজ্জা বোধ হচ্ছে। যা করবার মা-ই করবেন।

মহাপুরুষজী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে আনা সম্বন্ধে মত দেওয়ায় অজিতবাবু বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি এখন ডাক্তারি সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রসঙ্গ করিতেছেন। মহাপুরুষজীও সব শুনিতেছেন খুব আগ্রহসহকারে। একস্থানে অজিতবাবুর কথায় মহাপুরুষজী বলিলেন—একটা secret (রহস্য) বলছি, যারা সমাধিস্থ হয় তাদের মাথায় যন্ত্রণা কোন দিনই হয় না। এমন কি মাথা ধরা বা মাথা ঘোরা এ-সবও কিছু থাকে না।

অজিতবাবু কথায় কথায় বলিলেন—হার্টের (হৃৎপিণ্ডের) ক্রিয়া কখনো বন্ধ হয় না। ফুসফুসের ক্রিয়াও খানিকক্ষণ বন্ধ রাখা যায়, কিন্তু হার্টের বিশ্রাম আদৌ নেই।

মহাপুরুষ মহারাজ তাহাতে বলিলেন—তা হার্টও বিশ্রাম পায়। ওরও বন্দোবস্ত আছে। সমাধি হলে হার্ট বেশ বিশ্রাম পেয়ে থাকে।

বেলুড় মঠ

১১ বৈশাখ, রবিবার, ১৩৩৯—২৪ এপ্রিল, ১৯৩২

আজ সারাদিন বহু ভক্তসমাগম চলিয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ এতটুকুও বিশ্রাম করিতে পারেন নাই। অথচ অক্লান্তভাবে সকলের সঙ্গে আনন্দে ভগবৎ-প্রসঙ্গাদি করিতেছেন। সকলেই পরিতৃপ্তপ্রাণে ফিরিয়া যাইতেছে।

বিকালবেলা প্রায় তিনটার সময় জনৈক সন্ন্যাসী কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসব সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী শতবার্ষিকী উৎসবের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলিলেন—এ উৎসব অনেক দিন ধরে হবে—নানাভাবে, সারা ভারতময়, শত শত স্থানে। ভারতেতর দেশে—ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও এ উৎসবের আয়োজন করা হবে। দেশবিদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারই এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি, কলাবিদ্যা ইত্যাদির প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে। দেশদেশান্তর থেকে সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ করে সর্বধর্মসম্মেলন প্রভৃতি করার আলোচনা হচ্ছে। আর সমগ্র ভারতের একশত জন নামজাদা পণ্ডিতের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা একত্র করে শতবার্ষিকী-স্মারকগ্রন্থরূপেও ছাপবার ইচ্ছা আছে। এখন মোটামুটি এইভাবে কাজ আরম্ভ করে যেমন যেমন কাজ এগুবে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে, সেইভাবে আপনাদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজের প্রসার করা যাবে।

মহাপুরুষজী শতবার্ষিকী উৎসবের পরিকল্পনা শুনিয়া খুবই খুশি হইয়া বলিলেন—এ তো অতি শুভ সংকল্প; খুবই চমৎকার হবে। নানাদেশে যুগাবতারের ভাব প্রচারিত হবে, তাতে বহু লোকের কল্যাণ হবে। এখন ঠাকুরকে স্মরণ করে পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে যাও।

সন্ন্যাসী—বিস্তর টাকার দরকার। সব চাইতে বড় ভাবনা যে, এত অর্থ আসবে কোত্থেকে।

মহাপুরুষজী—তা টাকাকড়ি সব এসে যাবে। তার জন্য তোমরা ভেবো না। এ তো স্বয়ং শ্রীভগবানের কাজ। তাঁর কাজে কি কিছুর অভাব হয়? তাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখ—অটুট বিশ্বাস। তাঁর কাজ তিনিই করবেন; আমরা নিমিত্ত মাত্র। দেখবে যে, অভাবনীয় উপায়ে সব যোগাড় হয়ে যাবে।

অতঃপর সন্ন্যাসী খুব কাতরভাবে বলিলেন—মহারাজ, আপনি একটু আশীর্বাদ করুন, যাতে এ বিরাট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়।

মহাপুরুষজী খুব যেন উত্তেজিত হইয়া আবেগভরে বলিলেন—আশীর্বাদ কি হে? এ যে আমার বাবার কাজ—আশীর্বাদ কি? আমরা তো তাঁর চাকর, তাঁর দাস। আমি বলছি—নিশ্চয়ই ভাল হবে, সব সফল হবে, নিশ্চয়।

এইমাত্র বলিয়া তিনি খুবই গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাঁহার মন যেন অন্য রাজ্যে চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই তাঁহার ঐ দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বাসবাণীশ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ এই স্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়া যাইবার পরে সন্ন্যাসী ভক্তসহ প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় মহাপুরুষজী ধীরভাবে বলিলেন—ঠাকুরের শতবার্ষিকী তহবিল খুলবার জন্য আমার তরফ থেকে কিছু নিয়ে যাও।

ইহা বলিয়া জনৈক সেবককে দশটি টাকা দিতে বলিলেন। তিনি ঐ টাকা হাতে করিয়া একটু চোখ বুঁজিয়া রহিলেন এবং ঐ টাকা দিয়া বলিলেন—যাও, কিছু ভেবো না। তাঁর কৃপায় টাকাকড়ির কোন অভাব হবে না। সব শুভ হবে।

সকলে চলিয়া যাইবার পরে মহাপুরুষজী আপনভাবে মগ্ন হইয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেবকের দিকে চাহিয়া যেন আপন মনেই বলিলেন—ঠাকুরের শতবার্ষিকী একটা মহা বিরাট ব্যাপার হবে; এরা যা ভেবেছে, তার চাইতে ঢের বেশি। খুব ভেবে দেখলাম—সমগ্র দেশ ঠাকুরের ভাবে মেতে উঠবে। এ শরীর ততদিন থাকবে না। কিন্তু তোমরা দেখবে কি বিরাট কাণ্ড হয়! তাঁর ইচ্ছাতেই এ-সব হচ্ছে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহাপুরুষজীর ঘরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—আজ খুবই লোকের ভিড় গিয়েছে। আমি তো দিনের বেলা দু-তিন বার আসবার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু ভিড় দেখে আর আসিনি। খুবই কষ্ট হয়েছিল আপনার। শরীর কেমন আছে?

মহাপুরুষজী—শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছ? অনেক সময় শরীর আছে কি না, এ বোধই আমার থাকে না—সত্য বলছি। তবে তোমরা এসে জিজ্ঞাসা করলে যা একটা কিছু বলতে হয় বলি। তা ছাড়া অত কে ভাবে? এই তোমরা আস, ভক্তেরা আসে, ঠাকুরের কথা বলি, আর বাকি সময় তাঁর দয়ার কথা ভাবি—ওতেই আনন্দ। আমি তো তাঁর কাছে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছি; কিন্তু তিনি যে কেন এখনো ডাকছেন না, তা তিনিই জানেন। এক এক সময় ভাবি যে, তাঁর একি অদ্ভুত লীলা। অমন স্বামীজী—তাঁকে কত অল্প বয়সে নিয়ে গেলেন! অথচ তিনি থাকলে তাঁর কত কাজই না হতো! অমন মহারাজ ছিলেন—তাঁকেও নিয়ে গেলেন। অথচ আমাকে এখনো ফেলে রেখেছেন তাঁর কাজের জন্য। আমি তো ওঁদের তুলনায় কিছুই নই। তিনিই জানেন, তাঁর কি ইচ্ছা। আমাকে একলা ফেলে রেখেছেন; আর আমায় কত ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে। ঠাকুরের সন্তানেরা এক একজন চলে যান, আর মনে হয় যেন বুকের এক একটি পাঁজর খসে গেল। অথচ সবই সইতে হচ্ছে। কাকেই বা আর বলব?

সন্ন্যাসী—মহারাজ, আপনি যত দিন আছেন আমাদেরই কল্যাণ। কত শত ভক্ত আসছে শান্তি পাবার জন্য; আর আমরাও আপনি আছেন বলে নিশ্চিন্ত আছি। ঠাকুরের সঙ্ঘশক্তি এখন আপনাকে কেন্দ্র করেই কাজ করছে। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তো চলে গেছেন; আমাদের পরিচালনার জন্য এখন ঠাকুর আপনাকে রেখেছেন।

বেলুড় মঠ

১৪ বৈশাখ, ১৩৩৯, বুধবার—২৭ এপ্রিল, ১৯৩২

আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'এশিয়া' মাসিক পত্রিকাখানি পড়িতে পড়িতে রাশিয়ায় আইন করিয়া বেকার বন্ধ হওয়ার অবস্থার খবরে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—বা! বেশ হয়েছে। এ-সব শুনেও কত আনন্দ হয়! আহা, ভারতবর্ষে কী দুর্দশা শ্রমিকদের! পরাধীন দেশে কে ভাবে গরীবদের জন্য? তাদের কি কখনো সুদিন আসবে না? ঠাকুর, এদের একটা গতি কর, তুমি তো দীনজনের জন্য এসেছিলে।

ইহা বলিতে বলিতে আবেগভরে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিতেছেন—তা হবে। শীঘ্রই এর একটা উপায় হবে। স্বামীজী বলেছিলেন যে, এবার শূদ্রশক্তির জাগরণ। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের ভেতর নবজাগরণের সূচনা হয়েছে; ভারতবর্ষও বাদ যাবে না। কোন বহিঃশক্তি এ অভ্যুত্থানকে রোধ করতে পারবে না; কারণ এর পেছনে রয়েছে ঐশী শক্তি—যুগাবতারের সাধনা। ঠাকুরের শক্তি কত ভাবে কত দিকে খেলা করবে, তা একমাত্র জেনেছিলেন স্বামীজী; আর কেউ তা বুঝতে পারেনি। ঠাকুর দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি স্বামীজীর ভেতর সংক্রামিত করে দিয়ে বলেছিলেন—'আজ তোকে সব দিয়ে ফতুর হলুম।' আর যুগধর্মপ্রচারের সমস্ত ভারও দিয়েছিলেন স্বামীজীর ওপর। স্বামীজীও সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জগতের হিতের জন্য কাজ করে গেছেন। যে ভাবধারা তিনি জগতে রেখে গেছেন, সে-সকল ভাব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে নানা আধারের ভেতর দিয়ে ক্রমে ফলপ্রসূ হবে এবং সমগ্র জগতের সর্বাঙ্গসুন্দর উন্নতি-সাধনের কারণ হবে নিশ্চয়।

একটি দীক্ষিত বালকভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি সস্নেহে তাহাকে সামনে বসিতে বলিলেন এবং কুশলপ্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন—নিয়মিত জপ করিস তো? খুব করবি। জপ করতে ভুলিসনি—বুঝলি? ঠাকুর যুগাবতার, তাঁর নাম করতে করতে প্রাণে কত আনন্দ পাবি! প্রাণভরে প্রার্থনা করবি—'প্রভু, আমি বালক, কিছুই জানিনে। তুমি দয়া কর—ভক্তিবিশ্বাসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে দাও। আর তোমার স্বরূপ যে কি, তা বুঝিয়ে দাও।' তা হলেই সব হবে। খুব ডাকবি কাতরপ্রাণে। গুরু তোর দিকে সস্নেহে চেয়ে আছেন, এই ভেবে ধ্যান করবি। একদিনে সব ঠিক হয় না। সরলপ্রাণে করে যা, ক্রমে হবে।

পরে ছেলেটিকে ঠাকুরের প্রসাদী ফলমিষ্টান্নাদি সামনে বসাইয়া খাওয়াইলেন। সে হাতমুখ ধুইতে ছাদের উপর গেলে মহাপুরুষজী বলিলেন—ছেলেটির লক্ষণ ভাল। এর হবে। আমরা লোক দেখলে বুঝতে পারি। ঠাকুর আমাদের এ-সব অনেক শিখিয়েছিলেন। খালি বাইরে দেখতে শুনতে ভাল হলেই হয় না; ভক্তের লক্ষণ আলাদা।

জনৈক ভক্ত প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—মহারাজ, ধ্যানজপ তো করে যাচ্ছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাচ্ছিনে। আর মনও স্থির করতে পাচ্ছিনে। দয়া করে আশীর্বাদ করুন; আর কি করলে আনন্দ পাব, তার উপায় বলে দিন।

মহাপুরুষজী সস্নেহে বলিলেন—ধ্যানজপে আনন্দ কি, বাবা, অত সোজা? অনেক সাধনায় তা হয়। খুব খাটতে হবে। মন শুদ্ধ হওয়া চাই। ভগবানের উপর যত আপনার বোধ বেশি হবে, আর তাঁকে যত বেশি ভালবাসতে পারবে ততই বেশি আনন্দ পাবে তাঁর নামে। নাম-নামী অভেদ। তিনি প্রেমময়, আনন্দময়; তাঁকে যত বেশি ভাববে, তত বেশি আনন্দ পাবে। মন স্থির না হলে কিছুই হবে না। ধ্যানজপ, প্রার্থনা খুব করে যাও! দেখবে ক্রমে শরীর-মনে এক নতুন বল পাবে; ক্রমে রুচি আসবে তাঁর নামে। মন তো সাধারণত নানা বিষয়ে ছড়িয়ে থাকে। সেই ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে এনে ধ্যেয় বস্তুতে লাগাতে হবে। খুব প্রার্থনা কর। প্রার্থনা বড় সহায়ক জিনিস। যখন জপধ্যান করতে পারছ না দেখবে, তখনই খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবে। আর মাঝে মাঝে এখানে এস, সাধুসঙ্গ করো; তাতে মনে খুব বল পাবে। সাধুদের কাছে এসে ভক্তিভরে ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে হয়। নইলে বাজে কথা বললে তাতে তোমারও কিছু লাভ হয় না, আর সাধুরও সময় নষ্ট হয়। আসল কথা হচ্ছে ধ্যানজপ, প্রার্থনা, স্মরণ-মনন, সৎগ্রন্থাদি-পাঠ, ভগবৎ-প্রসঙ্গ—এই-সব করে নানাভাবে ভগবানকে নিয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, একটা কাজ কর দেখি; যাও এক্ষণই ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে খুব প্রার্থনা কর। বল—'ঠাকুর, তুমি আমায় রক্ষা কর; আমি নিরাশ্রয়, অজ্ঞান। প্রভু, তুমি দয়া কর, কৃপা কর, আমায় বল দাও। তোমারই এক সন্তান আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।' এইভাবে খুব কাতর প্রার্থনা কর। তিনি কৃপা করবেন, তোমার প্রাণে আনন্দ দেবেন।

বিকালবেলা চিঠিপত্রাদি পড়া হইতেছিল। জনৈক ভক্তের চিঠি শুনিয়া বলিলেন—এই ঠিক। এই ব্যাকুলতা ঠিক ঠিক হলে আর ভাবনা কি? লিখে দাও—'খুব কাঁদ, খুব ডাক, খুব জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ কর, জ্বলে-পুড়ে মর—তবে তো হবে।' ঠাকুর বলতেন যে, লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে, কিন্তু ভগবানের জন্য কজন কাঁদে? ভগবানলাভ হলো না বলে যে কাঁদে, সে তো মহা ভাগ্যবান। তার ওপর ভগবানের কৃপা হয়েছে নিশ্চয়। শান্তিলাভ কি সোজা কথা? তত্ত্বজ্ঞানলাভ না হলে শান্তি কোথায়? তাঁতে যখন মন সমাধিস্থ হয় তখনই প্রকৃত শান্তি; তার পূর্বে নয়। হঠাৎ তো হবার জিনিস নয়; লেগে থাকতে হবে—খানদানি চাষার মতো।

জনৈক ভক্ত প্রার্থনা জানাইয়া লিখিয়াছেন যে, যেন এ জন্মেই ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—লিখে দাও: 'বাবা, তোমার মনে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, তাতে খুবই আনন্দিত হলাম। তাঁর কাছে খুব কাতর প্রার্থনা জানাও। তিনি অন্তর্যামী। তিনি জানেন, তাঁর ভক্তকে কখন কি দিতে হবে। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। প্রকৃত

ভক্ত এ জন্ম সে-জন্ম গ্রাহ্য করে না। এ তো অতি নীচু কথা। যাতে পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম হয়, তাই ঠাকুরের কাছে জানিও। এ জন্মের সে-জন্মের কথা জানিও না। তুমি বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেমে ভরপুর হয়ে যাও—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ঠিক ঠিক ভক্তের প্রার্থনা হবে—

'এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।
দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো।
নরকে বা নরকান্তং প্রকামম্।।'

অর্থাৎ এই আমার একান্ত প্রার্থনা যে, স্বর্গ মর্ত বা নরক যেখানেই বাস হোক না কেন, হে নরকনিবারণকারি, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার অচলা ভক্তি হয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ হলে তখন সবই স্বর্গ—সবই আনন্দময় তোমার তাই হোক তাঁর কৃপায়।

অপর একজন ভক্তের চিঠির জবাবে লিখিতে বলিলেন—প্রভুকে যে চায় সেই পায়। তবে ঠিক ঠিক চাওয়া চাই। ডাকার মতো ডাকতে হবে, তবেই তিনি দর্শন দিবেন। ঠাকুর বলতেন, 'ভগবান যেন চাঁদামামা, সকলেরই মামা। যে চায় সে পায়।' প্রভুর বিরহে তাঁকে না পাবার দরুন কাঁদতে কেউ কাউকে শেখাতে পারে না; সময়ে উহা আপনা আপনিই আসে। ... তাঁর জন্য প্রাণে যখন ঠিক ঠিক অভাব অনুভব হবে, ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে যখন প্রাণ ছটফট করবে, তাঁর বিরহে যখন জগৎ শূন্য দেখবে, তখনই বুক ফেটে কান্না আসবে। সে সৌভাগ্য কখন আসবে, তা কেউ জানে না। তাঁর কৃপা হলেই সে-অবস্থা হবে এবং তুমি হৃদয়েই তা অনুভব করবে। খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক, খুব প্রার্থনা কর—প্রভু, কৃপা কর, কৃপা কর বলে। তিনি তোমার প্রার্থনা শুনবেন—আমি বলছি। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। আন্তরিক প্রার্থনা করছি, প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বেলুড় মঠ

১৫ বৈশাখ, ১৩৩৯, বৃহস্পতিবার—২৮ এপ্রিল, ১৯৩২

জনৈক সন্ন্যাসী উত্তরকাশীতে তপস্যা করিতে গিয়া খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং ওখানকার নানা অসুবিধার কথা জানাইয়া লিখিয়াছেন। মহাপুরুষজী চিঠির জবাবে তাঁহাকে লিখিতে বলিলেন—ওখানে অসুখে ভোগার চাইতে সত্বর এদিকে চলে এস। উত্তর-কাশীতেই যে মুক্তিলাভ হবে এমন তো কোন কথা নেই? সব জায়গায়ই মুক্তি হতে পারে, সমাধিলাভ হতে পারে, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, তাঁর কৃপা হয়। দেখলে তো এতদিন ওখানে থেকে। এখন এদিকেই চলে এস এবং এদিকেই সাধন-ভজন যেমন করছিলে তেমনি কর।

আসল কথা তো হলো তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করা, তা এখানে এসেও হতে পারে। অনেক সাধুর ও-সব জায়গা সহ্য হয় না—রোগে ভুগে ভুগে অকালে মারা যায়, কিংবা বেশি কঠোরতা করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সব, বাবা, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। নিরন্তর তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর। ক্রমে তাঁর কৃপা হৃদয়ে উপলব্ধি করবে। সমাধি না হলে তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় না, আবার সে সমাধিলাভও তাঁর কৃপা ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা। তা কোন স্থান-বিশেষের জন্য অপেক্ষা করে না। স্বয়ং ঠাকুরের জীবনেই দেখ না। তিনি তো তপস্যা করতে উত্তরকাশীও যাননি বা হিমালয়েও ঘুরে বেড়াননি। তাঁর জীবনকে আদর্শ করে চলতে হবে। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কাজই এ যুগের আদর্শ। ঐ হলো সব চাইতে পাকা নজির।

একজন ব্রহ্মচারী বৈরাগ্য হওয়ায় একেবারে হিমালয়ে গিয়া হাজির হইয়াছে তপস্যা করিবার জন্য। সে সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলিলেন—বাবা, অত ঘোরাঘুরি ভাল নয়। ওতে কিছু হয় না। অবশ্য একেবারে কিছু হবে না কেন? কিছুটা হয়। তবে ও-সব সাময়িক; তার ফল খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। আসল কথা, স্থায়ী কিছু লাভ করতে হলে আমাদের ঠাকুর-স্বামীজীর মঠে বসে ভজন-সাধন করতে হবে। ঐ জন্যেই তো স্বামীজী বুকের রক্ত দিয়ে মঠ করে গেছেন। এত সাধুসঙ্গ! এমন সব সাধু পাবে কোথায়? এমন শুদ্ধ, পবিত্র, বৈরাগ্যবান, বিদ্বান, মুমুক্ষু সাধুদের সঙ্গ মেলা দুর্লভ। তাছাড়া এখানে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ সব রয়েছে। সাধন-ভজনের এমন অনুকূল স্থান আর কোথাও নেই। যাদের ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হয়, তারা কি অত জায়গা বেছে বেছে ঘুরতে পারে? এক জায়গায় চুপচাপ বসে পড়ে। হিমালয়ে কোথাও কোথাও বেশ ভাল সাধু, বৈরাগ্যবান তপস্বী দু-এক জন আছেন। তাঁরা খুব নিভৃত স্থানে থাকেন। আর বাকি সব বেশির ভাগই কোন রকমে দিন কাটায়। হরি মহারাজ তাই তো বলতেন—'আমরা তো চোর। সর্বক্ষণ কি সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে পারি? অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়। তার চাইতে একটু একটু সেবার কাজ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভজন-সাধন করা ভাল।' ঘোরাঘুরি কঠোরতা এ-সব আমরাও তো কম করিনি? জীবনে সে-সব অভিজ্ঞতা ঢের হয়েছে। হিমালয়ে, পাহাড়-জঙ্গলে, যেখানেই গেছি ধ্যানজপ খুবই করতাম। দেখেছি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির বোধ আর কতক্ষণ থাকত? বেশিক্ষণ নয়। মন যখন নির্বিষয় হয়ে ধ্যেয় বস্তুতে মগ্ন হয়ে যেত, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বোধই থাকত না। দেশকালের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়ে যায়, তখন তো এক আনন্দ—সচ্চিদানন্দঘন। ভেতরে সব জায়গাই এক রকম। বাইরে আর কি সৌন্দর্য আছে? কিছুই নয়। সব সৌন্দর্যের খনি তো ভেতরেই। যা ব্যক্ত হয়েছে, তা তো সসীম, তার ইতি করা যায়; কিন্তু যা অব্যক্ত, তা অসীম। যতই অন্তরতম প্রদেশে মন প্রবেশ করবে, ততই মন তাতে মগ্ন হয়ে যাবে। 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।'* তিনি কত বিরাট!

---

* পরমপুরুষের এক পদে সমগ্র জগৎ-সংসার অভিব্যক্ত হয়েছে। অব্যক্ত তিন পাদ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অমৃতস্বরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

তাঁতে মন একবার লিপ্ত হয়ে গেলেই ব্যস। তখন মন আর বাহ্যিক কোন কিছুতেই আনন্দ পায় না। সব শান্তির আকর তো তিনিই। তাঁকে দর্শন না করতে পারলে মানবজীবনই বৃথা। ভগবদ্দর্শন না হলে কিছুই হলো না।

বেলুড় মঠ

৭ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৯—২১ মে, ১৯৩২

বিকালবেলা। জনৈক ভক্ত সাধন-ভজনে মন স্থির করিতে পারিতেছেন না বলিয়া খুব নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন—মহারাজ, চেষ্টা তো করছি; কিন্তু মন স্থির হয় না। কি করা যায়, দয়া করে বলুন। আমার কি কিছুই হবে না?

মহাপুরুষজী দৃঢ়ভাবে বলিলেন—বাবা, দেড় মাস তো আরো ছুটি রয়েছে। যেমনটি বলেছি তা করেই দেখ না। অল্পেতেই এত হতাশ হলে চলবে কেন? শ্রদ্ধা চাই, ধৈর্য চাই। লেগে পড়ে থাকতে হবে। একটুতেই কিছু হচ্ছে না বলে হা-হুতাশ করলে কি হবে? মন স্থির করবার বা ভগবদানন্দ পাবার কোন কৃত্রিম উপায় আমরা, বাবা, কিছু জানিনে। আমি যে উপায় জানি বা ঠাকুরের কাছে শিখেছি, তা তোমায় বলেছি। আর এও বলছি যে, এ পথে চট করে কিছু হবার নয়। নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এক ভাবে লেগে থাকতে হবে—ভজন-সাধন করে যেতে হবে। যে-মন এত কাল নানা বিষয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, সে-মনকে ধীরে ধীরে কুড়িয়ে এনে ভগবচ্চরণে মগ্ন করতে হবে। ঠাকুরকে ডাক; আর লেগে পড়ে থাক। ক্রমে মন স্থির হবে, আনন্দ পাবে। একটা শক্তি মানো তো? তোমাদের পক্ষে ভগবানের সগুণ সাকার ভাবই ভাল। তাতে সহজে মন স্থির করতে পারবে। আমি পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে যেতাম। পরে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এলাম, তখন তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—'তুই শক্তি মানিস্?' আমি বললাম যে, আমার নিরাকারই ভাল লাগে; তবে এও মনে হয় যে, একটা শক্তি সর্বত্র ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। পরে তিনি কালীঘরে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি তো মন্দিরের দিকে যেতে যেতেই ভাবস্থ হয়ে পড়লেন এবং মায়ের সামনে গিয়ে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। আমি একটু ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। কালীমূর্তির সামনে প্রণাম করতে প্রথমটায় মনে একটু দ্বিধা বোধ হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো যে, ব্রহ্ম তো সর্বব্যাপী; তা হলে তিনি তো এ মূর্তির ভেতরেও রয়েছেন; অতএব প্রণাম করতে তো কোন আপত্তি নেই। এই মনে হওয়া মাত্রই আমিও প্রণাম করলাম। তারপর ঠাকুরের কাছে যত যাতায়াত করতে লাগলাম, ততই আস্তে আস্তে সাকারে খুব বিশ্বাস হয়ে গেল। আমার মহাভাগ্য যে, ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি।

বেলুড় মঠ

১৬ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৩৯—৩০ মে, ১৯৩২

পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং পাশ্চাত্যদেশবাসীরা ভারতবাসীদের অপেক্ষা ঢের বেশি সুখে আছে—এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—ও-সব সুখ তো ক্ষণিক সুখ। ওতে আছে কি? ওরা ভগবদানন্দের আস্বাদ কখনো পায়নি বলে ঐ ক্ষণিক আনন্দে মত্ত হয়ে আছে! বাবা, যে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। তা স্বর্গেই থাক আর যেখানেই থাক—বিদ্বানই হও আর যাই হও; কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলেছে—

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি.. ।'*

আসল সুখ সেই ভূমা বস্তুতে। তাই জানতে হবে। বিজ্ঞান, সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি। বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে জড়বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে করতে ভোগস্পৃহা দিন দিনই বাড়তে থাকে। তাতে তৃপ্তি কোথায়? তাতে শান্তি কোথায়? ভোগের ভেতরেই তো অশান্তির বীজ।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।'**

পরে জীবনে শান্তিলাভ করার প্রসঙ্গে বলিলেন—অনাত্ম বস্তুতে শান্তি নেই। আত্মজ্ঞানলাভেই প্রকৃত শান্তি। আর সেই শান্তির সন্ধানও করতে হবে ভেতরে। শান্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবৎপ্রেম—সব ভেতরে। সাধন-ভজন কর, ভগবানকে ডাক। বাবা, শান্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয়।

রাত্রে দীক্ষা সম্বন্ধে বলিলেন—দীক্ষা অনেক রকম। সকলকে যে জপের মন্ত্র নিতে হবে এমন কি কথা আছে? সকলের ভাব তো আর এক রকম নয়, আর আধারও সব ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য সাধারণ গুরুরা এ-সব পার্থক্য বুঝতে পারে না। কারো সাকার ভাল লাগে, কারো নিরাকার। সাকার-নিরাকারের মধ্যেও আবার অনেক রকম আছে। কারো ধ্যান ভাল লাগে—সে ধ্যান করবে, কারো জপ ভাল লাগে—সে জপ করবে। কাউকে আবার ধ্যান-জপ দুই-ই করতে হবে। কার কি ভাব, কার কি ঘর, তা জেনে তবে সে-ভাবে সাধককে উপদেশ দিতে হয়। নইলে সব এক ছাঁচে ফেলে দিলে তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে বিলম্ব হবে নিশ্চয়।

---

* যে বস্তু ভূমা, তাহাতেই সুখ; অল্পে (অনিত্য বস্তুতে) সুখ নাই। ভূমাই শাশ্বত সুখস্বরূপ। ভূমারই অন্বেষণ করিতে হইবে।

** কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার শান্তি হয় না, বরং ঘৃতনিক্ষেপ দ্বারা যেমন অগ্নি অধিকতর সতেজ হইয়া উঠে, সেই রকম কামনা ভোগের দ্বারা আরও বাড়িয়া যায়।

সাধুভক্তদের ঘোরাঘুরি করা সম্বন্ধে বলিলেন—দেখ, ভক্তদের বেশি ঘুরে বেড়ানো ভাল নয়। তাতে ভক্তিলাভের হানি হয়। তাই একটু আধটু ঘুরে চুপচাপ এক জায়গায় বসে ভজন-সাধন করতে হয়। তাতে ভাব ভক্তি জমে। বেশি ঘোরাঘুরি করলে ভাব শুকিয়ে যায়। অবশ্য পরিব্রাজক-অবস্থা আলাদা। তখন থাকতে হয় একটা ব্রত নিয়ে।

বেলুড় মঠ

১৩৩৮-৩৯, বিভিন্ন সময়ে—১৯৩২

আজকাল মহাপুরুষ মহারাজ অহোরাত্র এক অনির্বচনীয় দিব্যভাবে অবস্থান করছেন। কখন কখন সেই ভাবের এতই আতিশয্য হয় যে, সারা রাতই ভাবের ঘোরে বিনিদ্র অবস্থায় কেটে যায়। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই। সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বালকের মতো মধুর হাসি হাসিয়া বলেন—আরে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? যতক্ষণ ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য রাখবেন, ততদিন এ শরীর যে করেই হোক থাকবেই।

দীর্ঘ দিন নিদ্রা না হইলে শরীরের পক্ষে তো উহা মহা ক্ষতিকর হইতে পারে, এইরূপ বলিলে তিনি বলিলেন—যোগীদের আবার ঘুমের প্রয়োজন কি? মন সমাধিস্থ হলে আর ঘুমের দরকার হয় না। তা ছাড়া ধ্যানেরই এমন একটা অবস্থা আছে, যে-অবস্থায় মন উঠলে শরীরের সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। সুষুপ্তির পরে যেমন শরীর বেশ সতেজ বোধ হয়, তার চাইতেও বেশি সতেজ বোধ হয় ঐ ধ্যানের অবস্থায়। একটা অব্যক্ত আনন্দে সমস্ত দেহ মন ভরে যায়। আমি তো যখনই শরীরে ক্লান্ত বোধ করি, তখনই শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে ঐ ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে থাকি—ব্যস, আনন্দম্। ঠাকুরকে দেখেছি—তিনি প্রায়ই ঘুমুতেন না; কখন বড়জোর এক আধ ঘণ্টা। তিনি তো অনেক সময় সমাধিস্থ হয়েই থাকতেন। আর বাকি সময় ভাবাবস্থায় কেটে যেত। রাত্রিতেই যেন তাঁর ভাবের আধিক্য হতো। সারারাত মায়ের নাম করে, হরিনাম করে কাটিয়ে দিতেন। আমরা দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুরের কাছে রাত্রে থাকতুম, তখন খুবই ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো। তাঁর আদৌ ঘুম নেই; যখনই ঘুম ভেঙে যেত, শুনতে পেতাম তিনি ভাবাবেশে মার সঙ্গে কথা কইছেন, কিংবা বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কখনো রাত দুপুরেই আমাদের ডাকতেন—'হাঁ রে, তোরা এখানে ঘুমুতে এসেছিস? সারারাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তো ভগবানকে ডাকবি কখন?' তাঁর গলার শব্দ পেলেই আমরা ধড়মড় করে উঠে ধ্যান করতে বসতাম।

কিছুদিন মহাপুরুষজীর একটি বিশেষ অবস্থা হইয়াছিল। যত লোকই তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিত, সকলকেই তিনি প্রণাম করিতেন করজোড়ে ভক্তিভরে। মঠের প্রবীণ বা নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরনারী, বালকবালিকা, দর্শনাকাঙ্ক্ষী সকলকেই

তিনি দেখামাত্রই আগে যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিতেন কুশলপ্রশ্নাদি। তাহাতে সাধুভক্তগণ সকলেই খুব অভিভূত হইয়া যাইত। আর যত সাধুভক্ত আসিতেন তাঁহাকে দর্শন করিতে, সকলকে কিছু-না-কিছু না খাওয়াইয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। বিশেষ করিয়া কুমারী ও বালক-নারায়ণদের ফল-মিষ্টান্নাদি পরিতোষপূর্বক খাওয়ানো চাই-ই।

একদিন রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত, নিস্তব্ধ। মহাপুরুষজীর ঘরে একটি সবুজ রঙের আলো জ্বলিতেছিল। তিনি বিছানায় সুখাসনে উপবিষ্ট। সারারাত দুই জন সেবক পালাক্রমে মহাপুরুষজীর কাছে থাকেন এবং যখন যাহা সেবার প্রয়োজন হয়, তাহা করেন। রাত দুটায় সেবকদের পালা বদলাইবার সময়। সে-সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সেবক বিছানার পাশে আসিতেই তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

সেবক নাম বলিলে অমনি মহাপুরুষজী করজোড়ে তাহাকে প্রণাম করিলেন। সেবক তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য; অতএব নিজের গুরু তাহাকে এইভাবে প্রণাম করায় তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। সে অশ্রুপূর্ণলোচনে আবেগভরে হাত জোড় করিয়া বলিল—মহারাজ, আপনি আমায় প্রণাম করলেন কেন? আমি যে আপনারই চরণাশ্রিত। এতে যে, মহারাজ, আমার মহা অকল্যাণ হবে।

সেবকের এরূপ কাতরোক্তিতে মহাপুরুষজী একটু বিচলিত হইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—দুঃখ করিসনি, বাবা। এতে তোর কোন অকল্যাণ হবে না, আমি বলছি; আমার কথা বিশ্বাস কর। তোর প্রাণে যে খুব কষ্ট হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বল? আমি যে তোর ভেতর 'নারায়ণ' দেখতে পাচ্ছি। আমি কি তোকে প্রণাম করছি? তোর ভেতর যে ভগবান রয়েছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখে প্রণাম করছি। তোরা ভাবিস যে, তোদের প্রণাম করি। তা নয়। ঠাকুর যে আমায় কত ভাবে কৃপা করছেন, কত কি দেখাচ্ছেন—তা আর কি বলব!

এইমাত্র বলিয়াই চুপ হইয়া গেলেন।

অন্য এক সময় জনৈক সেবক সকলকে তাঁহার প্রণাম করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন—যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাই; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তার ভেতরকার যা সত্তা, সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবির্ভূত হয়। লোকজন যেন ছায়ার মতো অস্পষ্ট, আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখায়। তাই তো প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় রূপের অন্তর্ধান হয়। তখন লোকজন স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও পারি।

সেবক—মহারাজ, আপনি তো দিব্য দৃষ্টিতে সকলের ভেতর ভগবান দর্শন করে সকলকে প্রণাম করেন, কিন্তু আমরা তো আর তা বুঝতে পারিনে। আমাদের মনে হয় যে, এ আবার কি ব্যাপার! কোথায় আপনাকে সকলে প্রণাম করতে আসে, না আপনিই

সকলকে প্রণাম করেন! সাধুভক্তদের মনে তাতে খুবই দুঃখ হয় এবং মনে নানা রকমের খটকা লাগে। আর অনেকে অনেক রকম ভাবেও।

মহাপুরুষজী—তা ভাবলেই বা। আমি কি আর এ-সব নিজে করি? কেন যে করি, তা অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারিনে; অবাক হয়ে যাই। তা অন্যে এর কি বুঝবে? এর ভেতর ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি, যেমন বলাচ্ছেন তেমনি বলছি। ঠাকুর যে এ শরীরটাকে আশ্রয় করে কত লীলাই না করছেন, তা কাকেই বা বলি আর কেই বা বুঝবে? তোমরা তো সব ছেলেমানুষ—বালক। এ সময় মহারাজ, হরি মহারাজ বা শরৎ মহারাজ যদি থাকতেন তো তাঁরা এ-সব ঠিক বুঝতেন; আর আমিও তাঁদের কাছে প্রাণের কথা বলে শান্তি পেতাম। তা তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনই হবে। তাঁর পাঁঠা, তিনি ঘাড়েও কাটতে পারেন, আবার লেজেও কাটতে পারেন। এখন দিন দিন শরীরের কর্ম যত কমে যাচ্ছে ততই ভেতরের কর্ম বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে যে এ শরীর আর কতদিন থাকবে তা তিনিই জানেন।

বেলুড় মঠ

২১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৯—৪ জুন, ১৯৩২

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তত ভাল নাই। রক্তের চাপ বাড়িয়াছে, রাত্রে নিদ্রাও ভাল হয় না। আজ সকালেই এক মহা দুঃসংবাদ আসিয়াছে। শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয় সকাল প্রায় ৬টা ১৫ মিনিটের সময় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। এ সংবাদ-শ্রবণে মহাপুরুষ মহারাজ শোকাকুল চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আর বেশিক্ষণ যেন ঐ ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। আস্তে আস্তে নিকটস্থ সাধু ও ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—ঠাকুর আমায় এমন করে রেখেছেন যে, একটু গিয়ে যে মাস্টার মশাইকে দেখে আসব তারও জো ছিল না। তিনি তো তাঁর ভক্তদের সব একে একে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, আর আমায় ফেলে রেখেছেন এ-সব শোকতাপ সইতে। তাঁর যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন! আহা, মাস্টারমশাই সারা কলকাতা যেন আলো করেছিলেন। কত ভক্ত তাঁর কাছে গিয়ে ঠাকুরের কথা শুনত, প্রাণ জুড়াত। এ অভাব আর পূরণ হবে না— will never be made good. তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গই ছিল না। ঠাকুরময় তাঁর জীবন। ঠাকুর ওঁকে কত ভালই না বাসতেন! দক্ষিণেশ্বরে কতদিন রয়েছেন। ওঁর খাওয়া-দাওয়া তো খুব সাদাসিধে ছিল—এই সামান্য দুধ ভাত। ঠাকুর নিজে চাকরানীকে বলে দুধ জোগাড় করে দিতেন—ভাল দুধ, আধসেরটেক।

মাস্টারমশায়ের শরীরও খুব বলিষ্ঠ ছিল। তাই তো ঠাকুরের অত কাজ করতে পেরেছেন। তাঁর মুখে যা যা শুনতেন, বাড়ি এসে তাই টুকে রেখে দিতেন। পরে সে-সব নোট থেকেই তো অমন 'কথামৃত' রচনা করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তিও অদ্ভুত ছিল। ঐ তো অল্প অল্প লিখে রেখেছিলেন; তাই থেকে পরে ধ্যান করে করে সব স্মরণ করতেন, এবং ঐ করে 'কথামৃত' লিখেছেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের লোক। ঠাকুর যেন ঐ কাজ করাবার জন্যই তাঁকে এনেছিলেন সঙ্গে করে। শনি-রবিবার বা ছুটির দিনে প্রায়ই মাস্টারমশায় ঠাকুরের কাছে যেতেন আর কলকাতায় কি অন্য কোন স্থানে ঠাকুর এলেও তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতেন। বেশ ভাল ভাল কথা হচ্ছে, একঘর লোক, হঠাৎ ঠাকুর মাস্টারমশায়কে লক্ষ্য করে বলে উঠতেন, 'মাস্টার, বুঝেছ? এ কথাটা বেশ ভাল করে শুনে রেখো।' কোন কোন সময় তিনি অনেক কথা বারংবার বলতেন। আমরা তো তখন বুঝতে পারিনি কেন ঠাকুর মাস্টারমশায়কে ঐভাবে বলতেন। ঠাকুরের কথা সব এত ভাল লাগত যে, আমিও একটু একটু লিখে রাখতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন তো দক্ষিণেশ্বরে নিবিষ্টমনে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছি—খুব সুন্দর সুন্দর কথা হচ্ছিল। তিনি আমার ঐ ভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ বললেন, 'কি রে, অমন করে কি শুনছিস?' আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলুম। তাতে ঠাকুর বললেন, 'তোর ও-সব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।' আমার মনে হলো ঠাকুর যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই ঐ ভাবে বললেন। সেই থেকে আমিও কিছু লিখে রাখবার সংকল্প ত্যাগ করলুম। যা লিখেছিলুম, তাও পরে গঙ্গার জলে সব ফেলে দেই।

পরদিবস প্রাতে কলিকাতা হইতে কয়েকজন ভক্ত মঠে আসিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই দীর্ঘকাল যাবৎ মাস্টার মহাশয়ের নিকট খুব যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার সেবাদিও খুব করিয়াছেন। সকলেরই বিষণ্ণভাব। তাঁহাদের নিকট মাস্টার মহাশয়ের দেহত্যাগের বিবরণ আদ্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাদিগকে স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিলেন—আহা, তোমাদের বড্ড লেগেছে! এ সদ্য শোক—কারো কথায় এ শোক নির্বাপিত হবে না। বিনয় কোথায়? ওর প্রাণে খুবই লেগেছে। ও বহুকাল তাঁর কাছে ছিল এবং প্রাণ দিয়ে সেবাদি করেছে। কি করবে বল? এতে তো কারো হাত নেই। ঠাকুর নিজেই তাঁর লোকদের সব নিয়ে যাচ্ছেন, তবে আমরা জানি যে, আমাদের সঙ্গে আর ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টার মহাশয়ের যে সম্বন্ধ, তা চিরকালের, বুঝলে? এ সম্বন্ধ যাবার নয়। তোমরা ভুলেও মনে করো না যে, মাস্টারমশায়ের শরীর চলে গেছে আর সব শেষ হয়ে গেছে। কখনো নয়।

এইরূপ অনেক কথাবার্তার পর মহাপুরুষজী ভক্তগণকে খুব সান্ত্বনা দিলেন, এবং বিদায় দিবার সময় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ভয় কি, বাবারা, ঠাকুর আছেন। আমরাও তো এখনো আছি। মঠে আসবে যখনই সময় পাবে।

ভক্তেরা চলিয়া গেলে মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা, ভক্তদের একটা আশ্রয়স্থল, প্রাণ জুড়াবার স্থান ছিলেন মাস্টারমশায়। বিশেষ করে শরৎ মহারাজের দেহত্যাগের পরে

বহু ভক্ত তাঁর কাছে যেত। আর তিনিও অক্লান্তভাবে ঠাকুরের কথাবার্তা বলে বহুলোকের প্রাণে শান্তি দিতেন। এ অভাব পূরণ হবার নয়। তিনি পুণ্যাত্মা লোক—ঠাকুরের কত বড় কাজ তিনি করে গেছেন। 'কথামৃত'—একখণ্ড লিখেও যদি তিনি দেহত্যাগ করতেন, তবু চিরকাল হয়ে থাকতেন অমর। তাঁর কীর্তি অক্ষয়।

বেলুড় মঠ

৯ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৯—২৩ জুন, ১৯৩২

আজ সকাল হইতেই বেশ বৃষ্টি হইতেছে। মহাপুরুষ মহারাজের খুবই আনন্দ। হাতজোড় করিয়া জগন্মাতার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—মা, তুমি না বাঁচালে তোমার সৃষ্টি কি করে বাঁচবে? বৃষ্টির অভাবে যে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল!

পরে তাঁর নির্দেশমত পাশের ছাদের উপর পায়রা শালিক ও চড়ুই পাখিদের চাউল দেওয়া হইল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসিয়া খাইতেছে দেখিয়া মহাপুরুষজীর ভারি আনন্দ। বলিতেছেন—আমি তো আর বাইরে যেতে পারিনে, আমার এতেই খুব আনন্দ।

দুপ্রহরে খানিক বিশ্রামান্তে চুপচাপ বসিয়া আছেন তক্তপোশের উপর—অন্তর্মুখ ভাব। পরে জনৈক সেবককে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। 'উদ্ধব-সংবাদ' পাঠ হইতে লাগিল। দ্বাদশ অধ্যায়ে সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্যে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—

'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা।।
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্।।'

—হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, লৌকিক ধর্মাচরণ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত, দান-দক্ষিণা, ব্রত-যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তীর্থ-সেবাদি, যম, নিয়ম প্রভৃতি কোন ক্রিয়াদ্বারাই মানুষ আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, যেমন সর্বপ্রকার আসক্তিনিবারক সৎসঙ্গ আমাকে আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ আমার সান্নিধ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়।

'যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্'—শুনিয়া মহাপুরুষজী তদ্গতভাবে বলিলেন—আহা! আহা! কি সুন্দর কথা! দেখেছ, স্বয়ং ভগবান বলছেন যে, সাধুসঙ্গের তুলনা নেই। সাধুসঙ্গের ফলে সর্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ সব আসক্তিবর্জিত অবস্থা লাভ হয়ে যায়। সব কামনা-বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়, আর তখন শ্রীভগবানের সান্নিধ্য হয় অনুভূত। মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সাধন-ভজন কতটা করবে? তা ছাড়া ভজন-সাধন বা তপস্যা দ্বারা কি তাঁকে ধরা যায়? ভগবান ভক্তবৎসল। তিনি একমাত্র প্রেম ও ভক্তিতে তুষ্ট হন। যেখানে ব্যাকুলতা ও অনুরাগ, সেখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তো ঠাকুর বলেছেন—'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' সাধন-ভজন, ত্যাগ-তপস্যাদির দ্বারা

চিত্ত নির্মল হয়; আর সেই বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ হয় এবং শ্রীভগবান হন প্রকাশিত। আসল কথা হলো, আপনার জ্ঞানে তাঁকে ভালবাসা। গোপীরা জানত, 'আমাদের কৃষ্ণ'। কী আপনার বোধ! সেখানে ভগবদ্বুদ্ধি নেই, মুক্তিকামনা পর্যন্ত নেই; আছে কেবল অহৈতুকী ভালবাসা ও শুদ্ধা ভক্তি।

আর সাধুসঙ্গের এমনই মাহাত্ম্য যে, সাধুসঙ্গের ফলে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়। প্রকৃত সাধু কে? যাঁর হৃদয়ে শ্রীভগবান প্রতিষ্ঠিত। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা লাভ হয়। তোমাদেরও জন্মজন্মান্তরের অনেক পুণ্য যে, ঠাকুরের এ পবিত্র সঙ্ঘে এসে পড়তে পেরেছ। সৎসঙ্গের ফলে মানুষের সমগ্র জীবনের গতি একেবারে বদলে যায়। আর তার ফলও হয় খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী। আমাদের জীবনেও দেখছি, ঠাকুরের কাছে হয়তো দু-এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম—সব দিন তেমন বেশি কথাবার্তাও হতো না; কিন্তু তার ফল বহু দিন পর্যন্ত থাকত। কেমন যেন একটা নেশার মতো হয়ে যেত; সর্বক্ষণই ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম। তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান—যুগাবতার। তাঁর কৃপাকটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত—তিনি স্পর্শমাত্র ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।

সিদ্ধ পুরুষদের সংস্পর্শে এলেও মানুষের মনে ভগবদভাবের স্ফুরণ হবেই হবে। ঐ তো হলো মজা। কেউ বাস্তবিক ভগবান লাভ করেছে কি না তার পরীক্ষাও হলো এই। ভগবদ্দ্রষ্টা পুরুষের কাছে গেলেই প্রাণে ঈশ্বরীয় ভাব জেগে ওঠে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে একটি অতি সুন্দর কথা আছে—'যাঁহারে দেখিলে মনে উঠে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।।' যেমন আগুনের পাশে গেলে গায়ে তাপ অনুভূত হয়, তেমনি যথার্থ সাধুপুরুষদের কাছে গেলে মনপ্রাণ ভগবদ্ভাবে মেতে উঠবে।

'কুসুমের সহ কীট সুরশিরে যায়। সেইরূপ সাধুসঙ্গ অধমে তরায়।।' সংসারতাপে দগ্ধ হলে বা দুঃখ-কষ্টে পড়লেই যে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন, তা নয়। যারা সুখের ক্রোড়ে লালিতপালিত, ভোগবিলাসে মত্ত, তারাও যদি সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ লাভ করে, তা হলে তাদেরও মন থেকে তথাকথিত অনিত্য সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে চলে যায়, নিত্য সুখের দিকে মন ধাবিত হয় এবং সব চাইতে সেরা আনন্দ—সেই পরমানন্দের আস্বাদ পেয়ে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছেও কত ধনী বড় লোক এসেছিল। তিনি দয়া করে তাদের মনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা ভগবদানন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি ঠাকুরের দর্শন না পেতাম, তাঁর কৃপা লাভ না হতো, তাহলে কি এমনটি হতে পারতাম? তাঁর কৃপার কথা আর কি বলব?... ঠাকুর তো আর কেউ নন, সেই মা-কালীই ঐ রূপে প্রকাশিত হয়ে জগৎ উদ্ধার করছেন। আহা কী দয়া—কত দয়া! আমাদের মহাভাগ্য যে, এমন অবতারপুরুষের সঙ্গলাভ করেছি। আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। তোমাদেরও বলছি—তিনি যুগাবতার, জীবের রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা—ভগবান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক—সব হয়ে যাবে। ভক্তি, মুক্তি সব পাবে। আমার এই এক কথা।

বেলুড় মঠ

১১ শ্রাবণ, ১৩৩৯, বুধবার—২৭ জুলাই, ১৯৩২

বিকালবেলা মহাপুরুষজীর ঘর ঝাড়া হইতেছিল। সেইজন্য মহাপুরুষ মহারাজ পাশের ঘরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছেন এবং জনৈক ব্রহ্মচারীকে 'কালীনামের গণ্ডি দিয়ে আছি রে দাঁড়িয়ে' —এই গানটি নিজে গাহিয়া শিখাইতেছেন। মাঝে মাঝে শ্লেষ্মায় গলা বন্ধ হইয়া যাইতেছিল এবং গলা পরিষ্কার করিয়া গাহিতে গাহিতে বলিলেন—গলা নেই; এখন কি আর গাইব?

অথচ কি মধুর কণ্ঠ! পরে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে কানাই নাম ঘুচালে তোর'—এই গানটি ঠাকুর গাইতেন কি?

মহাপুরুষজী—হাঁ, ঠাকুর এ গানটি গাইতেন।

এই বলে নিজেই গাইতে লাগলেন—

কে কানাই নাম ঘুচালে তোর, ব্রজের মাখনচোর।
কোথারে তোর পীতধড়া, কে নিল তোর মোহন চূড়া।
নদে এসে নেড়ামুড়া পরেছ কৌপীন ডোর।।
এ কি ভাব রে কানাই, কি অভাবে রে কানাই।
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে তুমি পরেছ কৌপীন ডোর।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ।
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ, হরিনামে হয়ে বিভোর।।

গানটি গাওয়া হইলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আহা! ঠাকুর কি গানই গাইতেন! আর গান গাইতে গাইতেই ভাবস্থ হয়ে পড়তেন। অমন মধুর আর প্রাণমাতানো গান আর কারো শুনিনি। তাঁর গানে মনপ্রাণ ভরে রয়েছে। আর কী মনোহর নৃত্য! ভাবে তন্ময় হয়ে নাচতেন কি না! তাই অত সুন্দর দেখাত। তাঁর দেহটি অতি সুঠাম ও খুবই কোমল ছিল। ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি নৃত্য করতেন। সে-সব দৃশ্য এখনো যেন চোখের ওপর ভাসছে। তাঁর ঐ মনোহর নৃত্য দেখে আমাদেরও ভেতর হতে নাচতে ইচ্ছা হতো। তিনিও আমাদের টেনে নিয়ে ধরে ধরে নাচতেন। কখনো বলতেন—'লজ্জা কি রে? হরিনামে নৃত্য করবি, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এ তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে না পারে, তার জন্মই বৃথা'—এই-সব বলতেন। বরাহনগর মঠে আমরা সেই ভাঙা বাড়িটাতে এত নাচতুম যে, ভয় হতো বাড়ি ভেঙে পড়ে গেল বুঝি। আহা, ধন্য মহাপ্রভু! জীবের কল্যাণের জন্য তিনি কি না করে গেলেন। এই উচ্চ নামসংকীর্তন, হরিনামের ধ্বনি যতদূর পৌঁছায় ততদূর সব পবিত্র হয়ে যায়। গিরিশবাবু এ গানটি চমৎকার বেঁধেছেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার! কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী ইত্যাদি।

খানিক পরে মহাপুরুষজী ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে বারান্দায় গেলেন। হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গার দৃশ্য দেখিলেন। জনৈক শিষ্য এখনও ভগবানলাভ হইল না বলিয়া মানসিক মহা অশান্তি জানাইতেই তিনি বলিলেন—ঠাকুরের নিকট কেঁদে তাঁকে ডাক; ধীরে ধীরে হবে। বাবা! মনে কি অমনি শান্তি আসে? খুব ডাক, খুব কাঁদ।

গঙ্গায় একখানি নৌকা পালভরে যাইতেছিল। তাহা দেখাইয়া শিষ্যকে বলিলেন—দক্ষিণে বাতাসে নৌকাখানি কেমন পাল তুলে যাচ্ছে—এই দেখ! বুঝলে? গুরুকৃপা সাধন-ভজনের অনুকূল। মায়ের ইচ্ছায় তোমার তা হয়েছে। এখন খুব ভজন-সাধন লাগাও। রাত্রে কম খাবে, আর খুব জপধ্যান করবে। ধ্যানজপের প্রকৃষ্ট সময়ই হলো রাত্রি। গঙ্গাতীর, গুরুস্থান, আর এমন সব সাধুসঙ্গ—খুব শীঘ্র হবে। মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত জপ কর। সব মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাক। কাজকর্ম করবে, কিন্তু মন সর্বদা হরিপাদপদ্মে লিপ্ত রাখবে। (পরে গুনগুন করিয়া গাহিলেন)—'পীলে রে অবধূত, হো মাতোয়ারা, পেয়ালা প্রেম হরিরস কা রে' ইত্যাদি।

বেলুড় মঠ

১৩৩৮-৩৯, বিভিন্ন সময়ে—১৯৩২

এইসময় মহাপুরুষ মহারাজের ঘুম বড় একটা হইত না। সর্বক্ষণই কোন-না-কোন দিব্যভাবের প্রেরণায় আত্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। দিনের বেলায় মঠের সাধু ব্রহ্মচারী ও অগণিত ভক্তদের সঙ্গে নানাবিধ প্রসঙ্গের মাধ্যমে তাঁহার মনের সেই আনন্দভাবের কথঞ্চিৎ আভাস যেন ফুটিয়া বাহির হইত। কখন কখন এত উচ্চাবস্থার কথা বলিতেন যে, অনেকেই তার মর্মগ্রহণে সমর্থ হইত না। রাত্রিবেলাই বিশেষ করিয়া তাঁহার খুব ভাবান্তর লক্ষিত হইত। কখন আত্মারাম হইয়া, মনের আনন্দে বিভোর হইয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতেন। কখন বা উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী বা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। আবার আবৃত্তি করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে চুপ হইয়া যাইতেন। অনেক সময়েই তাঁহার বাহ্যজগৎ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞান থাকিত না।

একদিন তিনি তাঁহার তক্তপোশের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—চক্ষু মুদ্রিত। রাত্রি প্রায় দুইটা। সমগ্র মঠ নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ এই ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকার পরে ধীরে ধীরে আপন মনেই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।'

পরে নিকটস্থ সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এর অর্থ কি জানিস? সেবক মৌন হইয়া থাকায় তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন—যেমন নানা নদ-নদী দ্বারা সদা পরিপূর্ণস্বভাব ও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রের মধ্যে জলরাশি প্রবেশ করে, অথচ সমুদ্র তাতে মোটেই উদ্বেলিত হয় না, তেমনি সমুদ্রবৎ সদা পরিপূর্ণ ও ব্রহ্মানন্দে স্থিত জ্ঞানীর হৃদয়ে প্রারব্ধবশত কামনাসকল প্রবেশ করে সত্য, কিন্তু তাতে তাঁর মন আদৌ বিচলিত হয় না—তিনি কৈবল্যরূপ শান্তিলাভে আত্মারাম হয়ে অবস্থিত থাকেন। কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, নিরহংকার ও মমত্ব-বুদ্ধিশূন্য হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তিলাভ করেন।

কামনা-বাসনা থাকলে চির শান্তিলাভ করা অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসনা ভগবদ্‌কৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা করে আমার সব কামনা-বাসনা একেবারে মুছে দিয়েছেন; কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা কেবল তাঁর ইচ্ছায় তাঁরই কাজের জন্য রয়েছে; আমি তো শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে, তা অনেক সময় মনেই হয় না। তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই শরীর এখনো রেখেছেন। আমার কিন্তু কোন বাসনা নেই, বুঝলি? আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ।

এই বলিয়া ধীর স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; তিনি যেন এক নূতন লোক। তাঁহার দিকে তাকাইতে ভয় হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—মা আমায় কৃপা করে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাণ্ডার খালি করে আমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' তবু যে তিনি এ শরীরটা কেন রেখেছেন, তিনিই জানেন।

গভীর রাত। মহাপুরুষজী তাঁর খাটে বসিয়া আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার চোখ মেলিয়া দেখেন আবার চোখ বুজিয়া থাকেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বিড়াল ঘরের মেঝেতে মিউমিউ করিয়া ডাকিল। তিনি সে দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া বিড়ালের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তিনি যে বিড়ালকে প্রণাম করিতেছিলেন, নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নাই। সেইজন্য সে একটু সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—দেখ, ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি 'চিন্ময়'; ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা—কেবল নামের ভেদমাত্র; কিন্তু মূলে সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি। অনেক চেষ্টা করেও সে ভাবটা চাপতে পাচ্ছিনে। সবই চৈতন্যময়। এই বেড়ালের ভেতরও সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বল জ্বল করছে। এইভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর করে রেখেছেন। লোকজন আসে যায়; কথাবার্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকর্ম বা আহারাদি করতে হয় করি, যেন অভ্যাসবশত করে যাই। কিন্তু এ-সব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নাম-রূপ এ-সব তো

অতি নিম্নস্তরের ব্যাপার। নামরূপের ওপরে মন গেলেই ব্যস্। তখন সবই চিন্ময় আনন্দময়। এ-সব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয়, সেই জানে।

আরো কত কি বলিবেন মনে হইল, কিন্তু ঐটুকু বলিয়াই হঠাৎ চুপ হইয়া গেলেন। সেবক মুগ্ধপ্রাণ হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

... ...

শুধু গুরুসেবা করিলেই সব হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সাধন-ভজনের বিশেষ প্রয়োজন—সে-বিষয়ে মহাপুরুষ মহারাজ সেবকদের খুবই বলিতেন। ভজন-সাধন না থাকিলে শুধু মহাপুরুষদের সঙ্গ বা সেবাতে অনেক সময় মনে অহংকার-অভিমান আসিবার খুবই সম্ভাবনা—সে-বিষয়েও সেবকদের বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেন। একদিন গভীর রাত্রে জনৈক সেবককে বলিলেন—দেখ, আমার সেবা করছিস্, এ খুবই ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর ওপর যে, তাঁর একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধন-ভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, ভজন-সাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন, তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের ওপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি—বেশ মনে রাখবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র সাধনা। ভগবানের নাম, তাঁর ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব প্রতিভাত হয়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি; তবু তিনি আমাদের কত সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? ক্রমে সাধন-ভজনের দ্বারা সে-জ্ঞান তিনি পাকা করে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে তিনি কৃপা করেনও। তিনি যে ভগবান, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব জগন্নাথ, তা ক্রমে বুঝতে পেরেছি। তাঁর ঠিক ঠিক স্বরূপ কি—তিনি কৃপা করে জানিয়ে দিয়েছেন।...

জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ করবি। এখানে তো আর সব সময় কাজ থাকে না। কখনো দৈবাৎ কোন কাজের দরকার হয়। এ তো বেশ সুবিধা। খুব জপ করবি—বুঝলি? সময় বৃথা যেতে দিসনি, বাবা। তাঁর নামে একেবারে ডুবে যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না। যতটুকু করবি, তন্ময় হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো ঠাকুর গাইতেন—'ডুব দে রে মন কালী বলে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে'। যে-কোন কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন প্রাণ, আন্তরিকতা; তিনি সময় দেখেন না। আর ধ্যানজপ নিত্য নিয়মিতভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে-ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। গীতাতে ভগবান বলেছেন—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'। ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি, কুলকুণ্ডলিনী জেগে

উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা খুলে দেবেন। সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্না হলেই সব হলো। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'। সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তিনি দু-হাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য; কিন্তু নিচ্ছে কে? তাঁর কাছে একটু কাতরপ্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি, মুক্তি সব।

বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসেছিস ভগবান লাভ করবি বলে। ঐ তো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে নিরন্তর জপধ্যান, স্মরণ-মনন করে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নে; তখন খালি আনন্দম্—খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর কয় দিন? এই তো বৃদ্ধ শরীর! এখন চলে গেলেই হলো—তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপধ্যান করে যদি ইষ্টদর্শন করে নিতে পারিস তো তখন দেখবি যে, গুরু ও ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয়-মন্দিরেই চির-প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূলদেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়—তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা।

... ...

তোরা আমার কাছে আছিস, আমার শরীর অসুস্থ বলে দিনরাত সেবা করছিস। তা বেশ! কিন্তু একমাত্র তোরাই যে আমার সেবা করছিস আর খুব বড় কাজ করছিস অমন যদি ভাবিস তো তোদের মস্ত ভুল, বুঝলি? এই একটা কিছু এগিয়ে দিয়ে, একটু দেহের সেবা করে বুঝি আমার খুব সেবা করা হলো? তা নয়। অনেক দূরে থেকেও মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুর কাজ করলেই আমাদের সেবা করা হয়। ঠাকুরই হলেন আমার অন্তরাত্মা। যারা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও কায়মনোবাক্যে প্রভুর কাজ করছে, সাধন-ভজন দ্বারা প্রভুকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা আমার খুবই প্রিয়, তারা আমারই সেবা করছে। তাঁকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করলেই আমি তুষ্ট। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'। প্রভুর কাজ করে তারা গুরুসেবাফলের চাইতে আরো বেশি ফল পাবে।

বেলুড় মঠ

২০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৯—৬ অক্টোবর, ১৯৩২

মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইতেছে। প্রতিমা-নির্মাণের সময় হইতেই মহাপুরুষজী মায়ের চিন্তায় আত্মহারা বালকের ন্যায় সর্বদাই 'মা মা', করিতেছেন। অনেক সময় নিজেই প্রাণের আবেগে আগমনী গান গাহিতেছেন, আবার কখন বা মঠের কোন কোন সাধুকে নূতন আগমনী গান শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার প্রাণের আনন্দ-উৎস যেন সহস্রধারে প্রবাহিত হইতেছে।

কাল শ্রীশ্রীমায়ের বোধন হইয়া গিয়াছে। সকালে স্বামী তপানন্দ একটি গান খুব ভাবের সহিত গাহিলেন। মহাপুরুষজী মধ্যে মধ্যে ভাবে তন্ময় হইয়া 'অহা, অহা' করিতেছেন। আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না। অনেক কষ্টে ভাব সংবরণ করিয়া নিজেই গায়ককে বলিলেন—যা, যা; পালা, পালা। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে! এ যেন শুকনো দেশলাইর কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ করে জ্বলে ওঠে', তাই হয়েছে। (নিজের ভাব চাপিতে না পারায় যেন একটু লজ্জিত হইয়াছেন)

আজ সপ্তমী তিথি। ভোর ৪টা হইতেই নহবতে আগমনী সুর বাজিতেছে। পূর্বনির্দেশানুসারে ঠাকুরঘরে আগমনী গান হইতেছে—

'শারদ সপ্তমী ঊষা গগনেতে প্রকাশিল,
দশদিক আলো করি দশভুজা মা আসিল।' ইত্যাদি

মহাপুরুষজীও মধ্যে মধ্যে ঐ গানের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছেন, এবং পরে নিজেই গান ধরিলেন—

'আর জাগাসনে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
কত করে উমা এই ঘুমাল।' ইত্যাদি

ক্রমে পূজামণ্ডপে পূজা আরম্ভ হইল। মঠের সাধুবৃন্দ ও বহু ভক্ত নরনারী দলে দলে মহাপুরুষজীর নিকট আসিতেছেন। তিনিও সকলকেই খুব আশীর্বাদ করিতেছেন, আর বলিতেছেন—খুব আনন্দ কর। মা এসেছেন, এখন আনন্দ, খালি আনন্দ। প্রতি মুহূর্তে মহাপুরুষজী খুব ব্যস্তভাবে পূজা কতদূর অগ্রসর হইল, তাহার সংবাদ লইতেছেন। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সময় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিজে পূজামণ্ডপে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে সেবকগণ তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া পূজামণ্ডপে লইয়া আসিল। মায়ের শিশু করজোড়ে মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে যে কি দৃশ্য তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে মহাপুরুষজী মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উপরে আসিলেন। খুব গম্ভীর ভাব, মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রদীপ্ত।

সারাদিন লোকের ভিড়। আজ অবারিত দ্বার। মহাপুরুষজী সকলকেই প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তগণ প্রসাদগ্রহণান্তে ফিরিয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যারতির পর মঠের সাধুগণ 'কালীকীর্তন' করিতেছেন। মঠের দুই-চারিজন সাধু মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত। তাঁহার আজ মোটেই ক্লান্তিবোধ নাই, সারাদিনই আনন্দে মাতোয়ারা। নিকটস্থ সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষজী বলিতেছেন—দেখ, মঠে মায়ের পুজো যেমন হয় তেমনটি আর কোথাও হয় না। এখানকার পুজো ঠিক ঠিক ভক্তির পুজো। আমাদের কোন কামনা নেই, আমরা কেবল মায়ের প্রীতির জন্য এই পুজো করি। আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—'মা, তুমি প্রসন্না হয়ে আমাদের ভক্তিবিশ্বাস দাও আর সমগ্র জগতের কল্যাণ কর।' বল কি? এত সব শুদ্ধসত্ত্ব সাধু-ব্রহ্মচারী প্রাণপাত করে আন্তরিকভাবে মায়ের আরাধনা করছে, মা কি প্রসন্না না হয়ে থাকতে পারেন? তোমরা

সব সর্বত্যাগী মুমুক্ষু, তোমাদের কাতর আহ্বানে মা সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? এখানে মায়ের যেমন প্রকাশ তেমনটি আর কোথাও পাবে না, বাবা, ঠিক বলছি। লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে, কিন্তু এমন ভক্তি বিশ্বাস পাবে কোথাও? আমাদের হলো সাত্ত্বিক পুজো। আহা, অনঙ্গ খুব প্রাণ দিয়ে এ-সব পূজাদি করে। শাস্ত্রে আছে—প্রতিমা সুন্দর, পূজক ভক্তিমান, এবং যিনি পুজো করাচ্ছেন, তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ও নিষ্কাম হলে তবে সেই পুজোয় ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হয়। এখানে সবই আছে, তাই মায়ের এমন আবির্ভাব। মঠে সব ঠিক ঠিক হয়। আমাদের ঠাকুর এসেছিলেন ধর্মসংস্থাপনের জন্য। এ-সব পূজাদি মাঝে তো একরকম লোপ পেয়েই গিছিল। ঠাকুর এসে যেন এ-সবে একটা নতুন spirit (প্রাণ) দিয়ে গেলেন। তাই এখন সব পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে। এখন পুনরায় বহুলোক এ-সব পূজাদির অনুষ্ঠান করছে। আমাদের সেই বরানগর মঠ থেকেই স্বামীজী এ দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন। তখন অবশ্য ঘটে-পটে পুজো হতো। সেখানে একবার পাঁঠাবলিও হয়েছিল; সুরেশবাবু সে পাঁঠাটা দিয়েছিলেন। তারপর সব পাঁঠাটা দিয়ে হোম করা হলো। সে বলির ব্যাপারে মাস্টারমশায় প্রভৃতি ভক্তদের প্রাণে খুব লেগেছিল, তাঁরা সকলে মা ঠাকরুনের কাছে গিয়ে ও-বিষয় বলেন। তাতে মা বলেছিলেন, 'এদের প্রাণে যখন কষ্ট হচ্ছে, তা বলি না-ই বা দিলে।' সেই থেকে আমাদের আর পাঁঠাবলি দেওয়া হয় না। তারপর এ মঠেও স্বামীজীই প্রথম প্রতিমায় পুজো করেন। পুজোর কদিন মা ঠাকরুনও এসে বেলুড়ে ছিলেন—নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে। মা বলেছিলেন যে, প্রতি বৎসরই মা দুর্গা এখানে আসবেন।

জনৈক সন্ন্যাসী—আচ্ছা, মহারাজ, পাঁঠাবলি ছাড়াও তো পুজো হতে পারে?

মহারাজ—তা কেন হবে না? তিনিই তো বৈষ্ণবী শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের মঠে তো বলি হয় না, এখানে সাত্ত্বিক পুজো। শাস্ত্রে মানুষের প্রকৃতিভেদে তিন রকম পুজোর ব্যবস্থা রয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক পুজোয় বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নেই, তেমন কোন ঘটা নেই, খালি ভক্তির পুজো, নিষ্কামভাবে মায়ের প্রীতির জন্য পুজো। আমরাও সেই ভাবেই পুজো করি। আর যারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক তাদের পূজাদিও সেই ভাবের; সকাম পুজো—খুব জাঁকজমক করা চাই। তাদের জন্য শাস্ত্রে পশুবলি প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। সার কথা কি জান? তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করা। এ-সব পূজাদির উদ্দেশ্যও তো তাই। মাকে যদি একবার হৃদয়মন্দিরে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়, তা হলে এ-সব বাহ্যিক আড়ম্বরের আর প্রয়োজন হয় না। এখন মা এসেছেন, মাকে নিয়ে আনন্দ কর। আমাদের, বাবা, বিসর্জন নেই। মা আবার কোথায় যাবেন? মা এখানেই সদা বিরাজমানা। ঐ যে 'সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ'—এ-সব বাইরের কথা, সাধারণ লোকের কথা। আমরা জানি যে, মা সর্বদাই আমাদের হৃদয়মন্দিরে রয়েছেন।

বেলুড় মঠ

১৬ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৩৯—২ ডিসেম্বর, ১৯৩২

কয়েক মাস যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাদির যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথাপি রোগ ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজের প্রাণ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, খোকা মহারাজের এমন কঠিন অসুখ হইয়াছে। কেহ এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—খোকার এমন কি আর হয়েছে? এখন তো ক্রমে ভালর দিকেই যাচ্ছে। তাঁর কাজের জন্য তিনি যতদিন রাখবেন ততদিন থাকতেই হবে—এই পাকা কথা। আমি এই পর্যন্ত জানি, যে যাই বলুক। খোকারও তাই, আমারও তাই। আমরা, বাবা, মানুষ-বদ্যির কথা বিশ্বাস করিনে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? তিনি যতক্ষণ রক্ষা করবেন ততক্ষণ খোকার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু ক্রমে ডাক্তারদের নিকট খোকা মহারাজের অসুখের খুব বাড়াবাড়ির কথা যখন শুনিলেন, তখন তিনি খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—এ্যাঁ, বলে কি, না, [illegible] নয়। খোকার অসুখ অতটা এগিয়েছে? এই কয়টি কথার মধ্যে এতটা আবেগ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

আজ ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার। খোকা মহারাজ সকালের দিকে অনেকটা ভালই বোধ করিয়াছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে দেখিতে গেলে খোকা মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি সুধীর, ভাল আছ? আর সব খবর ভাল তো?' ইত্যাদি। এই সংবাদ পাইয়া মহাপুরুষজীর মন বেশ প্রফুল্ল। তিনি বারংবার বলিতেছেন—কেন, খোকা তো আজ বেশ ভালই আছে, সুধীরের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে লাগিল ততই খোকা মহারাজের শরীরের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। বুঝি প্রাণপক্ষী এ ভগ্ন দেহপিঞ্জরে আর আবদ্ধ থাকিবে না।

মহাপুরুষজীকে সে-সংবাদ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তিনি কোন অজ্ঞাত কারণে আজ খুবই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিপ্রহরে অন্যদিনের ন্যায় আজ আর বিশ্রাম করিলেন না। নিজের ঘরে সামান্য পায়চারি করিতেছেন। একবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জনৈক সন্ন্যাসী মঠের উঠানের দিকে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে যাচ্ছে? একজন সেবক উত্তর দিলে মহাপুরুষজী বলিলেন—ভরত এত বেলাতে খেতে যাচ্ছে? তারপর বলিলেন—ওর ভাবটি বেশ। বাড়ির গিন্নির মতন সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর নিজে খেতে যায়। মঠে সাধুভক্ত-সেবা ঠিক ঠিক হলে ঠাকুরও প্রসন্ন থাকেন। তিনি বলতেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনই এক।' সাধুভক্তের ভেতর তাঁর প্রকাশ বেশি।

অপরাহ্ন ৩টা ৫ মিনিটের সময় খোকা মহারাজ মহাসমাধি-যোগে শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হইলেন। মঠের সর্বত্র একটা গভীর বিষাদের ছায়া। মহাপুরুষজী এই দুঃসংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। শীঘ্রই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সব সংবাদাদি লইতেছেন, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর। পরদিন প্রাতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদ হইতে হঠাৎ মঠে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষজী 'খোকা আর নেই' বলিয়া একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ভিতরে যে এতটা শোকানল চাপা ছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। যেন মহামৌনের মধ্যে যে-কান্না প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা করিয়া নিয়াছে নির্গমন-পথ। অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেমানুষের মতো ফুকরাইয়া কাঁদিলেন। পরে একটু শান্ত হইয়া বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে আস্তে আস্তে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া খোকা মহারাজের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন অনেক কথা।

মহাপুরুষজী বলিতেছেন—খোকা বালককাল থেকেই বরাবর ত্যাগী ও কঠোরী, আর বড় সরল। কাশীতে বংশীদত্তের বাগানে রয়েছি; সেখানে খোকা এক ডুলি করে এসে হাজির। শরীর অসুস্থ, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকদিন পরে দেখা হতে ভারি আনন্দ; হেসে হেসে জ্বর করে ফেলল। আমি বামুনমায়ের কাছে খোকাকে নিয়ে গেলুম। তারপর একটু ভাল হতে গোবিন্দবাবু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলুম। ক্রমে অসুখ সেরে গেল। সে যাত্রায় কাশীতে একসঙ্গে কিছুদিন ছিলুম। খোকা তো খোকা। ঠাকুরের কাছে যখন যেত; তখন তো ছেলেমানুষ। ঠাকুর খোকাকে খুবই ভালবাসতেন, স্বামীজীও খুব ভালবাসতেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহাপুরুষজী নিজেই সুর করিয়া গাহিতেছেন—'ও তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি', ইত্যাদি। পরে বলিলেন—এ গানটি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কাশীপুর শ্মশানঘাটে গেয়েছিলেন। তাঁর লীলা বোঝা ভার। এই দেখনা, খোকা তো ডঙ্কা মেরে ঠাকুরের কাছে চলে গেল। তিনি ডাক দিলেই যেতে হবে। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের একে একে সব টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমায় যে কেন রেখেছেন, তিনিই জানেন। তাঁর পাঁঠা তিনি ঘাড়েও কাটতে পারেন, লেজেও কাটতে পারেন। তাঁর যেমন ইচ্ছে। আমায় তো এমনি করে রেখেছেন যে, কারো সঙ্গে একটু প্রাণখুলে যে হাসব, দুটো পুরনো কথা বলব, তেমন লোকটি পর্যন্ত রাখেননি। (একটু অনুযোগের স্বরে) অথচ আমায় থাকতে হবে।

বিকালবেলা খোকা মহারাজের সেবকদিগকে মহাপুরুষ মহারাজের নিকট লইয়া আসা হইল। তাহারা পূর্বদিন হইতে অভুক্ত অবস্থায় আছে এবং ক্রমাগত কান্নাকাটি করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া মহাপুরুষজীর চোখও ছলছল করিতেছে। নিজেকে অতি কষ্টে সামলাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন—"কিরে, খোকা মহারাজ আবার গেছেন কোথা? তিনি তো ঠাকুরের ভেতরই রয়েছেন। আমাদের কথা বিশ্বাস কর। খালি শোক করলে কি হবে? এ-সব শোকমোহ অজ্ঞান থেকে হয়। ঠাকুরঘরে যা, গিয়ে ধ্যান কর, প্রার্থনা কর, 'ঠাকুর, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।' তিনি শক্তি দেবেন। তাঁকে ধ্যান করলেই এ অবিশ্বাস

ও ভুল সব যাবে। কাঁদলে কি হবে? আমারও যে কান্না আসে না, তা নয়। আমিও কেঁদেছি, আবার জ্ঞানও এসেছে। জ্ঞান তো আছেই। ঠাকুর তো আমাকে এখনো রেখেছেন। আমার কথা শোন, বাবা, কিছু খা। তোদের আর কতটুকু শোক হয়েছে? তোরা আর খোকা মহারাজকে কদিন জানিস, আর কিই বা বুঝেছিস? আমায় যে একে একে কত শোক সইতে হচ্ছে অথচ নীরবে সব সয়ে যাচ্ছি! কি করব? ঠাকুর নিজে তাঁর বিভূতি সব নিজের ভেতর আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। এ রোধ করে কার সাধ্য? এঁরা এক একজন চলে যাচ্ছেন, আর আমার ভেতরটা যেন শেল বিঁধছে। মনে হচ্ছে যেন এক একখানা পাঁজরা খসে যাচ্ছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার খোকা মহারাজের সেবকদের সান্ত্বনা দিতেছেন এবং একটু খাইবার জন্য বার বার বলিতেছেন। তাহারা একটু শান্ত হইয়া চলিয়া গেলে মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা! ওদের খুব লেগেছে। সামলাতে একটু সময় নেবে। তবে সেই শান্তিময়ী মা তো সকলের ভেতরই রয়েছেন; তিনি সকলকেই কালে শান্তি দেবেন।

বেলুড় মঠ

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৩৯—নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৩২

একটু একটু শীতের আমেজ দিয়াছে। সন্ধ্যাকাল। আরাত্রিক শেষ হইবার পর মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ সকলেই ধ্যানাদিতে রত। এক অনির্বচনীয় শান্তি ও গাম্ভীর্য সর্বত্র বিরাজমান।

মহাপুরুষ মহারাজের ঘরও একেবারে নিস্তব্ধ। ঘরে সবুজ রঙের একটি আলো জ্বলিতেছে। মহাপুরুষজী পশ্চিমাস্য হইয়া সুখাসনে বসিয়া আছেন—ধ্যানমগ্ন। পার্শ্বে জনৈক সেবক পাখা দ্বারা আস্তে আস্তে মশা তাড়াইতেছে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ঘরের নিস্তব্ধতা যেন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আর তাঁহার শান্ত মুখমণ্ডল আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মঠের সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিদিনের ন্যায় মহাপুরুষজীর ঘরে আসিয়া তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ক্রমে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইতেছে না। কিছু পরে মহাপুরুষজী ধীরে ধীরে ওঁকার-ধ্বনি করিতেছেন, এবং ক্রমে একটু স্পষ্ট স্বরে 'হরি ওঁ হরি ওঁ' উচ্চারণ করিতেছেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কটা বেজেছে? সেবক খুব সঙ্কুচিত স্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন—নটা বেজে গেছে, মহারাজ।

মহারাজ—ঠাকুরের ভোগের ঘণ্টা পড়েছে?

সেবক—ভোগ অনেকক্ষণ উঠেছে। এখন তো প্রায় ভোগ নামবার সময় হলো।

মহাপুরুষজী খুব বেশি বেশি ধ্যানাদি করিতেছেন দেখিয়া সেবকের মনের ভিতর

মহা আন্দোলন চলিয়াছে। কারণ ডাক্তারদের বিশেষ অনুরোধ ছিল, যাহাতে মহাপুরুষজী ধ্যানাদি বেশি না করেন—উহা তাঁহার শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। সেইজন্য আজ সেবক সাহসভরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের এত ধ্যান করবার কি প্রয়োজন? আপনারা তো অমনি সাদা চোখেই ঠাকুরকে দেখতে পান, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন। তবে আপনারা এত ধ্যান করেন কেন?

মহাপুরুষজী স্নেহবিগলিত কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলিলেন—হাঁ, বাবা, ঠিক বলেছ। তিনি দয়া করে আমাদের দর্শন দেন এবং প্রয়োজন হলে কৃপা করে কথাবার্তাও বলেন। তা ঠাকুর, মা, স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই খুব দয়া করেন—সে নিশ্চয়। তাঁকে আবার আমরা ধ্যান করে দেখব কেন? আমি সেজন্য তো ধ্যান করিনে। তবে কি জান, এখান থেকে অনেকেই দীক্ষাদি নিয়ে যায়, কিন্তু সকলে তো আর সমান ধ্যানজপ করতে পারে না। অনেকে আবার ধ্যানজপাদি করছে, কিন্তু ধর্মপথে এমন সব বাধা বিঘ্ন আছে যে, আর সে-রাজ্যে এগুতে পারে না। তাদের জন্যই আলাদা আলাদা ভাবে বিশেষ করে প্রার্থনাদি করতে হয়। একটু মনস্থির করে বসলেই সকলের চেহারা মনে ভেসে ওঠে। তখন একে একে তাদের জন্য প্রার্থনা করি। ধর্মপথে এগুবার যে-সব প্রতিবন্ধক আসে, তা দূর করে দিতে হয়। তা ছাড়া সাংসারিক দুঃখকষ্ট তো অনেকেরই আছে, তারও ব্যবস্থা করতে হয়। ঠাকুরই ভেতরে প্রেরণা দিয়ে এ-সব করাচ্ছেন। সংসারে শোকতাপ, দুঃখকষ্টের তো ইয়ত্তা নেই। সমগ্র জগতে যাতে শান্তি বিরাজ করে, দুঃখকষ্ট কমে যায়, সব মানুষ যাতে ভগবানের দিকে এগুতে পারে, তাই তো আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। আমরা নিজের জন্য তো কিছু করিনে, বাবা।

মহারাজের প্রতি কথায় প্রাণের আবেগ ফুটিয়া উঠিতেছে। হৃদয়স্থ প্রেমের উৎস যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কম্পিত কণ্ঠে মহারাজ বলিতে লাগিলেন—তিনিই সব করাচ্ছেন। সেই প্রেমময় প্রভুই এর ভেতরে বসে নানাভাবে খেলা কচ্ছেন। তিনি যেমনটি করাচ্ছেন, তেমনি করছি; যেমন বলছেন আমি তেমনি বলছি। আমি তো তাঁর হাতের সামান্য যন্ত্রমাত্র—তাও ভাঙা যন্ত্র। তা তিনি পাকা খেলোয়াড়, কানাকড়ি দিয়েও বাজি মাত করতে পারেন—কচ্ছেনও তো তাই! নইলে আমার কি সাধ্য আছে, বলো? না আছে পাণ্ডিত্য, না আছে বাগ্মিতা, না আছে আর কিছু, না দেখতে শুনতে ভাল। এই তো বুড়ো শরীর, নিচে পর্যন্ত নামতে পারিনে সব সময়। তবু তো তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। কত লোক আসছে! আমি সকলের সঙ্গে কথা বলেও উঠতে পারিনে—এত লোক আসে! তা তারা বলে—আপনার কথা বলতে হবে না। আপনাকে দেখলেই প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়, সব সন্দেহ মিটে যায়। আমি কিছু জানিনে, প্রভু জয়। তোমারই জয়! ধন্য প্রভু। তোমার মহিমা কে বুঝবে বল? আমি তো সব দেখে শুনে অবাক। এই শরীরের ভেতর তিনিই কত ভাবে না লীলা করছেন! তা কাকেই বা বলি, কেই বা তা বুঝবে! এর ভেতর বার সবটা জুড়ে তিনিই খেলা করছেন।

সেদিন সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) জিজ্ঞাসা করছিল, 'আপনার কাছে তো এত লোক দীক্ষা নিয়ে যাচ্ছে, আপনার সকলের কথা কি মনে থাকে? সকলকে আপনি চিনতে পারেন?' আমি বললুম—না, বাবা, আমার অত শত মনে থাকে না। কত জনের দীক্ষা হলো, কার ঘরবাড়ি কোথায়, কে কি করে না করে—তাতে আমার দরকার কি? আমি তাঁর নাম করি, তাঁর স্মরণ মনন করি, অন্য কিছুই জানিনে। দীক্ষাদির কথা যা বলছ, তাও তো তিনিই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এর ভেতরে বসে তিনিই সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমাকে দেখে এত লোক আসবে কেন? তবে তিনি এখন এই শরীরটাকে আশ্রয় করে তাঁর কত লীলা করছেন, আর আমি মাঝখান থেকে ধন্য হয়ে যাচ্ছি। যারা এখানে আসে, আমি সকলকেই তাঁর পায়ে সঁপে দি। বলি, 'এই নাও, ঠাকুর, তোমার জিনিস তুমি নাও।' লোকে যেমন নানারকম ফুল দিয়ে তাঁর চরণ পুজো করে, আমিও তেমনি নানারকম মানুষ অঞ্জলি করে—তাঁর শ্রীচরণে ঢেলে দিই। তা সকলকে তিনি গ্রহণ কচ্ছেন, তা স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁর পায়ে সঁপে দি, আর তিনি গ্রহণ করলেই খালাস। তিনিই সব ভার নিয়ে নেন। কল্যাণ-অকল্যাণের কর্তা তো তিনি। তবে আমার মনের শুভেচ্ছা তাদের জন্য সব সময়ে রয়েছে। প্রতিনিয়ত প্রভুর ইচ্ছায় আমিও তাদের কল্যাণ চিন্তা করি, তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

বেলুড় মঠ

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৩৯—নভেম্বর-ডিসেম্বর

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর অসুস্থ। রক্তের চাপ খুব বাড়িয়াছে। ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আছেন। চলাফেরা, কথাবার্তা, সবই খুব সাবধানে করিতে হয়। আজকাল আর নিচে নামিয়া বেড়াইতে পারেন না। বিকালবেলা কোন কোনদিন ঘরের পশ্চিম ধারের ছোট বারান্দায় সামান্য পায়চারি করেন, কোনদিন বা গঙ্গার ধারের বারান্দায় একটু বেড়ান। আজ একটু বেলা থাকিতে গঙ্গার দিকের বারান্দায় আসিয়াছেন, গঙ্গা দর্শন করিয়া 'জয় মা গঙ্গে' বলিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—ঠাকুর গঙ্গাজলকে ব্রহ্মবারি বলতেন। গঙ্গার হাওয়া যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়।

তিনি পরে মা ভবতারিণীকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। এইবার একগাছি ছড়িতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর ঘরের সামনে আসিয়া করজোড়ে স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। পার্শ্বে একজন সেবক সর্বদাই আছে। এইবার হাঁটিতে হাঁটিতে আস্তে আস্তে কথা বলিতেছেন—এই দেখ না, শরীরের কি অবস্থা! এখন দু-পা চলতেও কষ্ট হয়। অথচ এই শরীর, এই পা-ই তো কত পাহাড় পর্বত চলে বেড়িয়েছে, কত দেশ দেশান্তর ঘুরেছে, কত কঠোরতা করেছে! এমন অনেক সময় গেছে

যখন একখানা কাপড়ের বেশি সঙ্গে থাকত না। সেই এক কাপড়েরই অর্ধেক পরে আর অর্ধেক গাঁতি মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতুম। পথ চলতে চলতে হয়তো কোন কুয়োতে স্নান করে কৌপীন পরে থেকে কাপড়খানা শুকিয়ে নিতুম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র বৈরাগ্য, শারীরিক আরামের কথা মনেই হতো না। কঠোরতাতেই আনন্দ। কত তো নিঃসম্বল অবস্থায় বেড়িয়েছি, কিন্তু কখনো কোন বিপদে পড়তে হয়নি। ঠাকুরই সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন, কখনো অভুক্তও রাখেননি। অবশ্য এমন দিন গিয়েছে যে, খুব সামান্যই আহার জুটেছে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। দুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। খাওয়া হয়নি। নিকটে লোকালয় ছিল না। এমন সময় হঠাৎ পাশের বেলগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধুপ করে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। আমি এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নেই। তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়েই সেদিন কাটিয়ে দিলুম। বেশ বড় বেল ছিল।

তখন প্রাণে খুব ব্যাকুলতা ও অশান্তি ভগবানকে পাবার জন্য। চলতে চলতে ভগবানের স্মরণ-মনন হতো, আর ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতুম। লোকজনের সঙ্গ মোটেই ভাল লাগত না। যে-সব রাস্তা দিয়ে সাধারণত লোক চলাচল করে, সেই সব রাস্তা দিয়ে প্রায়ই যেতুম না। সন্ধ্যা হলে কোথাও থাকবার আস্তানা খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবেই রাত কাটিয়ে দিতুম। সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট সময় তো রাত। বাইরের কোলাহল কিছুমাত্র থাকে না, মন স্বতই শান্ত হয়ে আসে। এইভাবে অনেকদিন বেড়িয়ে কাটিয়েছি। এই রকম নিঃসম্বল অবস্থায় কিছুদিন কাটালে ভগবানের উপর একটা পূর্ণ নির্ভরতা আসে। সম্পদে বিপদে তিনিই যে একমাত্র রক্ষাকর্তা—এ ভাবটা বেশ পাকা হয়ে যায়।

এইবার মহাপুরুষজী চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কথা পূর্ববৎই চলিতেছে—এখন তো ঠাকুর দয়া করে তাঁর সেবার জন্য এখানেই রেখেছেন। এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। গুরু আর গঙ্গা দুদিকে আর মাঝখানে আমি বেশ আনন্দে আছি। এ স্থান তো বৈকুণ্ঠ! স্বয়ং জগন্নাথ এখানে রয়েছেন জগতের কল্যাণের জন্য, আর স্বামীজীর মতো সিদ্ধ মহাপুরুষ এখানে ছিলেন। কত ভাব, কত মহাভাব হয়েছে এখানে! আমাদের আত্মারাম ঠাকুর রয়েছেন। আর ঠাকুরের পার্ষদরা সকলেই এ স্থানে এখনো সূক্ষ্ম দেহে রয়েছেন, তাঁদের দেখাও পাওয়া যায়। কোথায় কোন একজন সাধক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাতেই সেই স্থান তীর্থে পরিণত হয়েছে; আর এ যে মহাতীর্থ! এ স্থানের প্রত্যেক ধূলিকণাও যে কত পবিত্র! ঠাকুর, স্বামীজী এঁরা যে কী ছিলেন, তা লোকের বুঝতে ও জানতে এখনো ঢের দেরি। জগতের হিতের জন্য এত বড় আধ্যাত্মিক শক্তি সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যেও জগতে আবির্ভূত হয়নি। বুদ্ধদেব এসেছিলেন—তার শত শত বৎসর পরে লোকে তাঁকে কতকটা বুঝতে পেরেছিল, তাঁর সেই উদার ভাব জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন দেখনা কোথায় বুদ্ধদেবের একটি দাঁত নিয়ে গেছে, তাতেই কি কাণ্ড! কত বড় দন্তমন্দির তৈরি

হয়েছে তার ওপর! আর এখানে ঠাকুর, মা, স্বামীজী—এঁদের ভস্মাস্থি রয়েছে। এ-সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। এই বেলুড় মঠের ধুলিতে গড়াগড়ি দেবার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে কত লোক ছুটে আসবে! তার সূচনাও বেশ দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর এখনো তো পঞ্চাশ বছর হয়নি। দেখনা এরই মধ্যে তাঁকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় কি কাণ্ডই না শুরু হয়েছে! আমরা ধন্য যে, এ-সব দেখতে পাচ্ছি। তোমরা আরো কত দেখতে পাবে!

ঠাকুরের কাজ ছিল ভাবরাজ্যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে। তাঁর জীবনাদর্শ সমগ্র জগতে ধর্মভাবের একটা আমূল পরিবর্তন শীঘ্রই এনে দেবে। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) একটা কথা বলতেন, 'নানা ধর্মমত তো চিরকালই আছে, রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থও রয়েছে, তীর্থস্থানাদিও অসংখ্য রয়েছে—সব দেশেই। তা সত্ত্বেও ধর্মের গ্লানি হয় কেন জান? কালপ্রভাবে ঐ-সবের আদর্শ নষ্ট হয়ে যায় বলে। তাই শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন ধর্মের গূঢ় রহস্য বোঝাবার জন্য—আদর্শ দেখাবার জন্য।' ঠাকুর এবার এসেছেন জগতের সমস্ত ধর্মমতের জীবন্ত আদর্শরূপে। তাই তাঁর নানা মতে সাধনা এবং সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ। ঠাকুরের জীবনই প্রত্যেক ধর্মাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ। এখন দেখবে তাঁর অলৌকিক জীবন হতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নতুন আলোক, নতুন আশা ও প্রেরণা পাবে এবং তাঁর জীবনাদর্শে নিজেদের ধর্মজীবন গড়ে তুলবে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মহাপুরুষ মহারাজ আস্তে আস্তে নিজ ঘরে আসিয়া বিছানায় পশ্চিমাস্য হইয়া করজোড়ে বসিলেন। সামনের দেওয়ালে ঠাকুরের একখানি সুবৃহৎ আলোকচিত্র। ঘরে আরো অনেক দেবদেবীর ছবি রহিয়াছে। মহাপুরুষজী ঠাকুর ও অন্যান্য সকল দেবদেবীর উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আরাত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। সাধু-ভক্তগণ মধুর কণ্ঠে সমস্বরে আরতির ভজন গাহিতেছেন। সর্বশেষে দেবী-প্রণাম গাওয়া হইল। মহাপুরুষজীও সেইসঙ্গে সুর করিয়া 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে'—ইত্যাদি গাহিলেন। ক্রমে চারিদিক নীরব-নিথর। মহাপুরুষজীও সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, চক্ষু মুদ্রিত—ধ্যানস্থ।

বেলুড় মঠ

১৩৩৮-৩৯, বিভিন্ন সময়ে—১৯৩২

মঠে দুর্গাপূজা হইতেছে। মহানবমীর রাত্রি। অন্য অন্য বৎসর এই রাত্রিতে কত ভজন-কীর্তনাদিতে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত থাকিত; কিন্তু এবার মহাপুরুষজীর শরীরের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। তাই আজ মঠভূমি নীরব। একটু অধিক রাত্রে মহাপুরুষজী ভজনাদির শব্দ না পাইয়া মঠের সাধুবৃন্দকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন—আজ মহানবমীরাত্রি, মহা আনন্দের সময়, ভজনাদি কিছু না করে তোমরা চুপচাপ আছ যে? কি ব্যাপার?

জনৈক সাধু—মহারাজ, আপনার শরীরের এই অবস্থা। আমরা কেমন করে ভজন করি? গোলমালে আপনার হার্টের অবস্থা আরো খারাপ হবে। তাই ভজনাদি কিছু করছিনে।

মহারাজ—কেন, তাতে হয়েছে কি? আমি বেশ আছি। ভজন শুনলে আমি বেশ ভাল থাকি। এ দেহের অসুখ বলে তোমরা আমার আনন্দময়ী মাকে ভজন শোনাবে না, আনন্দ করবে না? আমার কোনও কষ্ট হবে না। যাও, তোমরা ভজন করগে।

সকালবেলা মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মধ্যে অনেকেই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জনৈক সন্ন্যাসী প্রণামান্তে নিজের প্রাণের মহা অশান্তি ও বৈরাগ্যের কথা অতি কাতরভাবে নিবেদন করাতে মহাপুরুষজী বলিলেন—ভয় কি, বাবা। শরণাগত হয়ে পড়ে থাক তাঁর দুয়ারে। তিনি কাউকে বিমুখ করেন না।

সন্ন্যাসী—এতদিন বৃথা কেটে গেল; এখনো ভগবান লাভ হলো না, শান্তিলাভ হলো না। এক এক সময় দারুণ অবিশ্বাস মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এতকাল আপনাদের যে-সব উপদেশ বাক্য শুনেছি, সে-সবেও সন্দেহ এসে যায়।

এ কথা শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজের মুখমণ্ডল একেবারে রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—দেখ, বাবা, ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরাও সত্য। যা বলছি, ঠিক ঠিক বলছি; আমরা লোক ঠকাতে আসিনি। যদি আমরা ডুবি তো তোমরাও ডুববে; কিন্তু তাঁর কৃপায় জেনেছি যে, আমরা ডুবব না, আর তোমরাও ডুববে না।

... ...

মহাপুরুষ মহারাজ বেশি চলাফেরা করিতে পারেন না। সেজন্য একজন সেবকের উপর ভার ছিল যে, রোজ বিকালে ঘণ্টা দেড়েক সারা মঠ ঘুরিয়া অসুস্থ সাধুব্রহ্মচারীদের, গরুবাছুরগুলির এবং মঠের অন্যান্য বিষয়ের যাবতীয় খবর লইয়া সব তাঁহাকে বিস্তারিতভাবে জানাইবে। একদিন যথারীতি সারা মঠ ঘুরিয়া সব খবরাদি জানিয়া সেবক উপরে গিয়া দেখে যে, মহাপুরুষজী একা খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। চক্ষু অর্ধনিমীলিত, যেন জোর করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সেবক সামনে গিয়ে দাঁড়াইলেও অন্যদিনের ন্যায় কোন প্রশ্নই তিনি করিলেন না। মনে হইল যেন সেবকের উপস্থিতি তিনি আদৌ জানিতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া সেবক স্তম্ভিত হইয়া একপাশে সরিয়া গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে যখন তিনি এদিকে সেদিকে একটু চাহিতে লাগিলেন, তখন সেবক সামনে গিয়া অন্য দিনের মতন সব খবর বলিতে আরম্ভ করামাত্রই মহাপুরুষজী ধীরভাবে বলিলেন—দেখ, আমার কাছে এ জগৎটার কোন অস্তিত্বই নেই; একমাত্র ব্রহ্মই রয়েছেন। নেহাত মনটা নিচে নামিয়ে রাখবার জন্য কথাবার্তা বলি এবং পাঁচরকম খবরাখবরও নিই। এইমাত্র বলিয়া পুনরায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সেইদিন আর কোন খবরই শুনিলেন না।

... ...

কাশীপুর বাগানে অবস্থানকালে স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার একটি দর্শনের কথা একদিন

বলিয়াছিলেন—দেখ, কাশীপুরে স্বামীজীর সঙ্গে থাকতে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। তখন আমরা নিচের একটি ঘরে সকলে এক সঙ্গেই শুতাম। বিছানাপত্র তো তেমন কিছু ছিল না। প্রকাণ্ড একটি মশারি ছিল; তাই খাটিয়ে সকলে একই মশারির নিচে শোওয়া যেত। এক রাত্রিতে স্বামীজীর পাশে শুয়ে আছি, মশারির নিচে শশী মহারাজ প্রভৃতি আরও কে কে ছিলেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি মশারির ভেতরটা একেবারে আলোকময় হয়ে গেছে। স্বামীজী তো আমার পাশেই শুয়ে ছিলেন; কিন্তু দেখি যে স্বামীজী সেখানে নেই। তাঁর পরিবর্তে সেখানে সাত আট বছরের ছেলের মতো উলঙ্গ, জটাজূটধারী, শ্বেতবর্ণ একটি বালক শিব হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁরই অঙ্গচ্ছটায় সব আলোকিত হয়ে গেছে। আমি তো তাই দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। প্রথমটায় ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হলো, এ চোখের ভ্রম; ভাল করে চোখ রগড়ে আবার দেখলাম; ঠিক তেমনিভাবে ছোট্ট বালক শিব দিব্যি শুয়ে আছেন। তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম; শুতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ভয়ও হচ্ছিল যে, পাছে ঘুমের ঘোরে আমার পা লেগে যায় তাঁর গায়ে। সে-রাতটা ধ্যান করেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতে দেখি যে, স্বামীজী যেমন ঘুমুচ্ছিলেন তেমনই ঘুমুচ্ছেন। সকালে স্বামীজীকে সব বললাম। তিনি শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

অনেক দিন পরে হঠাৎ বীরেশ্বর শিবের স্তোত্র* পড়ে দেখি যে, তাঁর ধ্যানে ঠিক ঐরূপ বর্ণনা রয়েছে। তখন বুঝলাম যে, আমি ঠিকই দেখেছিলাম। স্বামীজীর স্বরূপই তাই। ঐ শিবের অংশেই তাঁর জন্ম কি না—তাই ঐ রকম দর্শন হয়ে গেল।

... ...

মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। চলাফেরা প্রায় একপ্রকার বন্ধ। নিচে নামিয়া বেড়ানো তো দূরের কথা, উপরেও অন্যের সাহায্য ব্যতীত একটু হাঁটিতে পারেন না। সেই সময় তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—বাইরের প্রচেষ্টা যত কমে যাচ্ছে, ভেতরের প্রচেষ্টা ততই বেড়ে চলছে। সেই পরমানন্দের খনি তো ভেতরেই। এখন এইভাবেই চলবে, এই ঠাকুরের ইচ্ছা।

আর প্রায়ই মধুর স্বরে এই গানটি গাহিতেন—'শমন আসার পথ ঘুচেছে; (আমার) মনের সন্দ দূরে গেছে' ইত্যাদি। নিজের দর্শনাদির কথাও মাঝে মাঝে কিছু বলিতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা, তখন ঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হয় নাই, সবেমাত্র সব ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ চুপচাপ বসিয়াছিলেন ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া। হঠাৎ

---

* বিভূতিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুম্
আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুবক্ত্রং দশনচ্ছদম্।
চারুপিঙ্গলজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননম্।
শৈশবোচিত-নেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্।। ইত্যাদি

অর্থাৎ বিভূতিভূষিত অষ্টবর্ষবয়স্ক বালক; তাহার নয়ন আকর্ণবিস্তৃত এবং বদন ও দন্তপাটি সুন্দর, মস্তকে সুন্দর পিঙ্গল বর্ণের জটা; সে নগ্ন ও সহাস্যবদন এবং তাহার অঙ্গে শৈশবোচিত মনোহর অলঙ্কার।

বলিলেন—দে দে, আমায় বিশ্বনাথের বিভূতি দে, আমার বিছানার উপর একখানি গরদের চাদর তাড়াতাড়ি পেতে দে। আহা, এই যে ঠাকুর এসেছেন, মহাদেব এসেছেন। বলিতে বলিতে হঠাৎ ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত এইভাবে ধ্যানস্থ ছিলেন।

... ...

আর একদিন বিকালবেলা বলিলেন—এইমাত্র স্বামীজী ও মহারাজ এসেছিলেন আর বললেন—'চল তারক—দা!' তোরা দেখতে পেলিনি? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন!

আত্মজ্ঞ পুরুষদের ছোট-খাট কাজকর্ম ও কথাবার্তার ভিতরও একটা গূঢ় রহস্য নিহিত থাকে। সাধারণ মানব নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের কার্যাবলী বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অনেক সময়ই সে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয় না। অনুমান ১৯১২ সালের কঠিন রক্তামাশয়-রোগের পর হইতে মহাপুরুষ মহারাজ আহারাদিতে খুবই বেশি ধরাকাট করিয়া চলিতেন। তাঁহার দুপুরের আহার ছিল খুব সাধারণ ঝোলভাত ও সামান্য ভাতে-ভাত। পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেই ঝোলকে ঠাট্টা করিয়া নাম দিয়াছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। রাত্রের আহারও তেমনি অল্প ও সাদাসিধে। কিন্তু সন ১৯৩৩ সালে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাক্‌শক্তি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবার প্রায় এক বৎসর কাল পূর্ব হইতে সেই মহাপুরুষ মহারাজই সেবকদের কখন কখন কোন বিশেষ জিনিস রান্নার ফরমাস করিতেন বা কোন বিশেষ জিনিস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এই প্রকার ভাবান্তর মঠের সমগ্র সাধুমণ্ডলী ও সেবকদের মনে একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল; বিশেষত সে-সময় তাঁহার শরীর খুবই খারাপ এবং ডাক্তাররাও তাঁহাকে অনেক সময় কেবলমাত্র জলীয় পদার্থ খাইতে বলিতেন।

একদিন সকালবেলা তিনি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া আছেন। পরে হঠাৎ বলিলেন—দেখ, ঠাকুরের কথায় পাঁকাল মাছের কথা আছে। তিনি বলেছেন—'পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত লাগে না। তেমনি কেউ যদি ভগবান লাভ করে সংসারে থাকে তো তার মনে আর সংসারের ছাপ পড়ে না।' আচ্ছা, এই পাঁকাল মাছ কি রকম একবার দেখতে হবে। আর খেয়েও দেখতে হবে পাঁকাল মাছ কেমন।

অনেক চেষ্টা করিয়া বরাহনগরের এক মেছুনীর সাহায্যে তিন-চারিটি পাঁকাল মাছ যোগাড় করা হইল। তিনি ঐ পাঁকাল মাছ দেখিয়া ভারি খুশি! বালকের মতো আনন্দ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ পাঁকাল মাছ তাঁহার জন্য রান্না করিয়া দেওয়া হইল। তিনি সামান্য একটু মুখে দিয়া দু-একবার মুখে নাড়াচাড়া করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—এই হয়ে গেল পাঁকাল মাছ খাওয়া। ইচ্ছে হয়েছিল, তাই একটু খেয়ে দেখলাম। ঠাকুর বলতেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাগুলি মিটিয়ে নিতে হয়। তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা কে জানে বাপু, যদি এতটুকু বাসনার জন্যই আবার জন্ম নিতে হয়?

... ...

তাঁহার সন্ন্যাসরোগ হইবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তিনি পাকা আম খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখনো বাজারে ভাল আম ওঠে নাই। কলিকাতার সব বাজারে সন্ধান করিয়া গুটিকতক আম তাঁহার জন্য আনা হইল। তিনি সবগুলি ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়া নিজের জন্য একটি মাত্র আম রাখিলেন এবং খাবার সময় ঐ আমটির রস করিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য সেবককে আদেশ করিলেন। তখন তিনি হাঁফানিতে কষ্ট পাইতেছিলেন; ঐ অবস্থায় আমের রস খাইলে যে কি ভয়ানক অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া সেবকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। অগত্যা প্রধান সেবক তাঁহাকে ডাক্তারদের মত জানাইয়া আমের রস না খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি খুবই গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—আমি বলছি, খাব। যখন আমের রস তাঁহার সামনে দেওয়া হইল, তিনি সেই আমের রস আঙুল মাত্র ডুবাইয়া একটু মুখে দিয়া বলিলেন—আমার আমের রস খাওয়া হয়ে গেল। ইচ্ছে হয়েছিল, তাই একটু মুখে দিলুম। আমি কি লোভ করে খাই? আমি যে কেন এটা ওটা একটু একটু চেয়ে খাই, তার অর্থ অন্যে কি বুঝবে? (পরে একটু যেন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন)—খাবার জন্য আমায় বলতে এসেছে! জান, ইচ্ছামাত্র এক্ষণি এ শরীর ছেড়ে দিতে পারি? তা তুচ্ছ খাবার! স্বামীজী কেন 'মহাপুরুষ' নাম রেখেছিলেন জান?... ইত্যাদি অনেক কথা সেইদিন বলিয়াছিলেন। সারা দিনই খুব গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহার মন যেন অন্য রাজ্যে বিচরণ করিতেছে।

... ...

জনৈক স্ত্রী-ভক্তের একমাত্র সন্তান কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। চিকিৎসাদিতে রোগের উপশম না হওয়ায় যখন ডাক্তারদের মতে রোগীর বাঁচিবার কোনই আশা ছিল না, তখন সেই স্ত্রীভক্তটি অনন্যোপায় হইয়া মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বাবা, আপনি একবার বলুন যে, আমার ছেলেটি সেরে উঠবে। স্ত্রীভক্তের প্রাণের বেদনা মহাপুরুষজীর অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি ধীরভাবে সব শুনিলেন। ভক্তটির বারংবার কাতর প্রার্থনার পরে তিনি বলিলেন—ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তো সেরে যাবে। কিন্তু ছেলেটি কয়েক দিন পরেই মারা গেল। তখন একমাত্র-সন্তানহারা হইয়া স্ত্রী-ভক্তটি তাঁহার নিকট খুবই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অনুযোগের সুরে বলিলেন—আপনি তো বলেছিলেন ছেলে ভাল হয়ে যাবে; তবে যে মারা গেল? আমি এখন কি নিয়ে থাকব? স্ত্রী-ভক্তটি বারংবারই তাঁহাকে এইভাবে অভিযোগ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে কী মর্মন্তুদ কান্না! তখন মহাপুরুষজী বলিলেন—দেখ, মা, আমি জানতুম যে, ছেলে বাঁচবে না; কিন্তু তুমি যে ছেলের মা। মা-র কাছে কি করে বলি যে, তার ছেলে মারা যাবে। তাই বাধ্য হয়ে বলেছিলাম যে, ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তো ভাল হয়ে যাবে। তুমি কেঁদো না, মা। আমি বলছি, ঠাকুর কৃপা করে তোমার প্রাণের সব শোক-তাপ মুছে দেবেন। তুমি এখন হতে ঠাকুরকেই তোমার ছেলে বলে ভাববে। তিনি দয়া করে তোমার সব অভাব পূর্ণ করে দেবেন, তোমার প্রাণে অপার্থিব শান্তি দেবেন।

তাঁর আশ্বাসবাণী ও আশীর্বাদ পাইয়া স্ত্রী-ভক্তটির প্রাণ শান্ত হইয়া গেল এবং পরে তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল অদ্ভুত পরিবর্তন।

... ...

একদিন বেলুড় মঠে কৃ—মহারাজ মহাপুরুষজীর নিকট জনৈক ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করিতেছিলেন। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন—দেখ কৃ—, ঠাকুর বলতেন বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়। তিনি যে শুধু এ কথা মুখেই বলতেন তা নয়, তাঁর দৃষ্টিই ছিল সেইরকম। তা নাহলে আমরাই কি তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারতাম? দোষ না দেখে তিনি কৃপা করে আমাদের টেনে নিয়েছিলেন বলেই তো আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছিলাম। একেবারে দোষ না আছে কার? এখানে সকলে পূর্ণ নির্দোষ হতে এসেছে, কিন্তু নির্দোষ হয়ে তো কেউ আসেনি। অমন একটু আধটু দোষ ক্রমে ঠাকুরের কৃপায় সব শুধরে যাবে। কোন রকমে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারলেই তিনি কৃপা করে ক্রমে ঠিক করে নেবেন।

মহাপুরুষজীর এই কথা শুনিয়াও কৃ—মহারাজ পুনরায় বলিলেন—আপনি ডেকে তাকে একটু ধমকে দিলে ঠিক হয়। তার সম্বন্ধে আপনি পূর্বে যা শুনেছিলেন, ও-সব বোধ হয় ঠিক নয়। আমি খুব ভাল রকমে জেনেই আপনাকে বলছি। তখন মহাপুরুষজী হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—দেখ, কৃ—, তুমি কি আমার চাইতেও বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন? ঠাকুরের কৃপায় আমরা এক নজরে সব বুঝতে পারি, লোকের ভেতর বার সব দেখতে পাই। ঠাকুর অনেক ভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে-সব তোমায় কি বলব? কাউকেই বলবার নয়। কে কেমন লোক, কার হবে না হবে, সে-সব আমরা খুব জানি। খালি বললে বা ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।

মহাপুরুষজীর গাম্ভীর্য ও চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া কৃ—মহারাজ একেবারে হাতজোড় করিয়া তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া বলিলেন—মহারাজ, আমি বুঝতে পারিনি। আমার অপরাধ নেবেন না, আমায় ক্ষমা করুন। তখন তিনি কৃ—মহারাজের পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—যদি কাউকে শোধরাতে হয় তো তার জন্য ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা কর—ঠাকুরকে বল। তিনি যদি দয়া করেন তবেই মানুষের মনের গতি চকিতে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

কৃ—মহারাজ চলিয়া যাইবার পরে মহাপুরুষজী যেন আপন মনেই বলিতেছিলেন—ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে, তারা কেউ কম নয়। সকলেই বিশেষ সুকৃতিসম্পন্ন। বাবা, সব জাত সাপের বাচ্চা—নতুন ব্রহ্মচারীই হোক আর অতি প্রাচীন সাধুই হোক। কত জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে আশ্রয়লাভ হয়।

... ...

তাঁহার এ মনোভাব শ্রোতাদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা সকলের উপরই সমভাবে বর্ষিত হইত এবং সকলেরই কল্যাণকামনায় তিনি সর্বদা নিরত থাকিতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যাহারা নানা হীনবৃত্তি

অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সঙ্ঘকে বিচ্ছিন্ন করিতেও কুণ্ঠিত ছিল না, তাহাদের জন্যও পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নাম করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার দয়ার কোন গণ্ডিরেখা ছিল না।

সর্বভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনেও নানা দিব্যভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাও বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ভাব আশ্রয় করিয়া ভগবৎলীলা আস্বাদন করিতেন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে (১৯৩২) কোন কোন দিন সকালবেলা দেখা যাইত যে, মহাপুরুষজী নিজের বিছানার উপর 'কথামৃত' 'গীতা' 'চণ্ডী' 'হিতোপদেশ' 'ঠাকুমার ঝুলি' একটি খঞ্জনি লাঠি ছবির বই ইত্যাদি নানা জিনিস লইয়া বসিয়া আছেন—যেন পাঁচ বছরের একটি বালক! আর ইচ্ছানুরূপ নাড়াচাড়া করিতেছেন সব জিনিস। হয়তো একটু খঞ্জনি বাজাইলেন, 'ঠাকুমার ঝুলি' একটু পড়িলেন, আবার বা হাসিতে হাসিতে লাঠি হাতে সেবকদের শাসাইতেছেন। তিনি কেন এরূপ করিতেন তাহার একটু আভাস পাওয়া যায় তাঁহার একদিনকার কথা হইতে। জনৈক সেবককে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—দেখ, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায়; তাই এ-সব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।

মহামানবদের বাহ্যিক ব্যবহারের গূঢ় মর্ম সাধারণ মানব বুঝিতে পারে না।

... ...

মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের শেষ তিন চারি বৎসর তাঁহার নিকট প্রতিদিন বহু দীক্ষাপ্রার্থী ও ভক্তের সমাগম হইত। তিনিও নিজ শরীরের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অকাতরে সকলকে কৃপা করিতেন। সেই সময়ে দেখা যাইত, তিনি প্রতিদিন বেলা ৯টার সময় কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজলে হাত-মুখ ধুইয়া দীক্ষাপ্রার্থীদের কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিদিনই দীক্ষাপ্রার্থী উপস্থিত থাকিত। তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। একদিন বহু ভক্তকে দীক্ষা দিয়া পরে বলিয়াছিলেন—বাবা, ঠাকুর বলতেন এক আধ জনকে দেখেশুনে দিতে হয়; কিন্তু এখন তো একেবারে বাঁধ ভেঙে গেছে। তিনি কেন যে এত লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসছেন তা তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছা; আমি আর কি করব বল? এইভাবে এই বুড়ো শরীরটা যে আর কদিন বইতে পারব তা তিনিই জানেন।

... ...

বেলুড় মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—দেখ, বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হলেন ঠাকুর। আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশ্রয়ে এসেছিস—তা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস, সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের ওপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে, তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর কদিন? এর পরে তোদের দেখেই লোকে শিখবে। ত্যাগই হলো সন্ন্যাস-জীবনের ভূষণ। যে যত বেশি ত্যাগ করতে পারে,

সে তত ভগবানের দিকে এগোয়। খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন, খালি বিরজাহোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হলো না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে, সেই হলো ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি, সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে, সামলাতে পারবিনি। নিজের জন্য টাকাকড়ি কিছু সঞ্চয় করতে নেই; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মতো এ ধার দিয়ে আসবে, আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না; তখন ময়লা জমতে শুরু করবে। আর কখনো কারো কাছে কোন জিনিস চাইতে নেই। তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র, খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় সব আসছে যে, সামলানো দায়। তাই ভাবি যে, ঠাকুরের কি ইচ্ছে! এমনও একদিন গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নতুন গরদ পরলেও ফুরোয় না। তবে কি জানিস, তাঁর দয়ায় মনটা তখনো যা ছিল, এখনো তাই। পরনের কাপড় ছিল না বলে মনে কোন দুঃখ ছিল না, কোন অভাব বোধ হতো না। তিনি কৃপা করে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ না, তোরা তো এখন আমায় দুহাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস; কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা, যখন শীতকালে কেবল খড় পেতে তার ওপর শুয়ে থাকতাম। তাতে যা আনন্দ, তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।

... ...

একদিন সকালে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া সেবক নিত্যকার মতো তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সেদিন সেবককে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—থাক না, তাতে আর হয়েছে কি? দীক্ষার মন্ত্র কে না জানে? আর ও-সব মন্ত্র তো বইতেই ছাপা আছে। তবে কি জানিস, বাবা, ঐ মন্ত্রই সিদ্ধগুরুর মুখ থেকে বেরুলে তাতে মন্ত্র-চেতন হয়। নইলে তো ওটা শব্দমাত্র। গুরু নিজ শক্তিবলে মন্ত্রচৈতন্য করে দেন আর জাগ্রতা করে দেন শিষ্যের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে। এই হলো আসল ব্যাপার।

... ...

নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যেন শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহাদের সাহচর্য ও সেবা জীবকে ভগবৎসান্নিধ্যে নিয়ে যায়; কিন্তু তাঁহাদের সেবা বা সঙ্গ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং দেববিগ্রহের সেবাপূজাদি সে তুলনায় অতি সহজ। সাধন-ভজন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত না হইলে মহাপুরুষদের প্রকৃত সেবা করা সম্ভব নয়। আর চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হইয়া মহাপুরুষদের সেবা করিতে গেলে তাহাতে সেবা-অপরাধ হইবার খুবই সম্ভাবনা।

মহাপুরুষ মহারাজের জনৈক সেবক নিজেকে সেবা-অপরাধে অপরাধী মনে করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মহারাজ, আপনার সেবা করতে অনেক সময়ই বহু ত্রুটি

হয়ে যায়, যাতে আপনিও খুব বিরক্তি প্রকাশ করেন। আপনারা সত্যসংকল্প, আপনাদের মুখ দিয়ে যা বেরুবে, তা তো সত্য হয়ে যাবে এবং আপনাদের অসন্তুষ্টিতে আমাদের মহা অকল্যাণ হবে নিশ্চয়। এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।

সেবকের কথা শুনিয়া মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। স্নেহ ও করুণায় তাঁহার মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া উঠিল। পরে খুবই আবেগভরে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—দেখ, বাবা, ঠাকুর এসেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। আমরাও তাঁরই সঙ্গে এসেছি। জীবের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আর কোন কামনা আমাদের নেই। স্বপ্নেও কখনো কারো অকল্যাণ কামনা করিনে। আর ঠাকুরও আমাদের দ্বারা কারো কোন প্রকার অনিষ্ট বা অকল্যাণ হতে দেবেন না। তোমরা আমার কাছে রয়েছ, সর্বক্ষণ আমার সেবা করছ, তোমাদের ভালমন্দ সমস্ত ভার ঠাকুর আমার ওপর দিয়েছেন। সেজন্য তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সব শুধরে নিতে হচ্ছে। তোমাদের ভালর জন্যই অনেক সময় গালমন্দ পর্যন্ত করি; কিন্তু সে-সবই বাহ্যিক। অন্তরে আছে স্নেহ, ভালবাসা আর দয়া। নইলে কাছে রাখা কেন? এ খুব জানবে যে, সবই তোমাদের ভালর জন্যই করি। তোমাদের শোধরাবার জন্য, তোমাদের জীবনের গতি যাতে সর্বতোভাবে ভগবন্মুখী হয়, সেজন্য প্রয়োজনবোধে অনেক সময় কঠোর ব্যবহারও করে থাকি এবং কেন ও-সব করি, তাও বেশ ভাল করে জেনেই করে থাকি। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। ঠাকুরের কাছে তোমাদের কল্যাণের জন্য কত যে প্রার্থনা করে থাকি, তার এতটুকু যদি জানতে, তা হলে তোমার মনে এমন আশঙ্কা কখনোই উঠত না। তা ছাড়া 'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ'—আমাদের ক্রোধও বরের মতো জানবে।

... ...

শেষ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইবার কয়েক মাস পূর্বে মহাপুরুষ মহারাজ সেবার বেলুড় মঠে প্রতিমায় বাসন্তীপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তা আর সম্ভব হয় নাই। সে সম্বন্ধে একদিন কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সেবক বলিয়াছিল—মহারাজ, আপনার যখন বাসন্তীপূজা করার বাসনা হয়েছে তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে। সেবক খুব সাধারণ ভাবেই একথা বলিয়াছিল, কিন্তু 'আপনার বাসনা হয়েছে' একথা শুনিয়া তিনি যেন চমকিত হইয়া বলিলেন—অ্যাঁ, কি বললি? বাসনা? আমার বাসনা হয়েছিল? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন বাসনা নেই। বিন্দুমাত্রও নেই। তখন সেবক নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিল—না, মহারাজ, আপনার শুভ ইচ্ছা যখন হয়েছে—। তখন তিনি বলিলেন—হাঁ, আমাদের শুভ ইচ্ছায়, তাঁর কৃপায় সব হতে পারে। কিন্তু আমার ঠাকুর ছাড়া পৃথক অস্তিত্বও নেই, আর আলাদা কোন ইচ্ছাও নেই। তাঁর ইচ্ছে যা হয় তাই হবে। কথা সামান্য, কিন্তু ইহাতেই বেশ বোঝা যায় যে, তিনি কায়মনোবাক্যে কতদূর রামকৃষ্ণগতপ্রাণ ছিলেন, আর ঠাকুরের সঙ্গে কতটা একাত্মবোধ অনুভব করিয়া এবং কতটা অহঙ্কারশূন্য হইয়া ছিলেন এ জগতে!

বেলুড় মঠ

২১ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৩৯—৭ ডিসেম্বর, ১৯৩২

বিকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবককে বলিলেন—শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ে এসো তো; একটু অজামিল-উপাখ্যান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। তদনুসারে ভাগবত-পাঠ আরম্ভ হইল।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে মহাভাগ! মানুষ পাপকর্ম হইতে কি প্রকারে বিরত হইতে পারে এবং নিজ পাপকর্মজনিত বিবিধ উগ্র যাতনাপূর্ণ নরকভোগ হইতেই বা কি প্রকারে তাহার নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব? তদুত্তরে শুকদেব বলিলেন—অগ্নি যেমন বৃহৎ বেণুগুল্মকে দগ্ধ করে, তেমনি শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণও তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম, নিয়ম ইত্যাদি সহায় করিয়া বুদ্ধি-ও বাক্যকৃত সমূহ পাপ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত খুবই কঠিন; সেইজন্য সর্বশেষে ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া বলিতেছেন—

'কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ।।'

অর্থাৎ সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকারাশি যেমন বিদূরিত হয়, তেমনি বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবল একান্ত ভক্তি দ্বারাই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরে অজামিলের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। অজামিল সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু পরে নিজ বিবাহিতা সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া এক সুরাপায়িনী দাসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং ক্রমে অক্ষক্রীড়া, কপটতা, বঞ্চনা, ও চৌর্য প্রভৃতি কলুষিত বৃত্তিতে আসক্ত হইয়া সমগ্র জীবন নানাবিধ পাপকর্মে লিপ্ত থাকেন। অজামিলের দশ পুত্র। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। তাহাকেই অজামিল সর্বাপেক্ষা বেশি স্নেহ করিতেন। অষ্টাশীতি বৎসর বয়সে অজামিল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন উগ্রমূর্তি যমদূতদের দেখিয়া ভয়ে নিজ পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। অন্তিমসময়ে 'নারায়ণ'—শ্রীভগবানের এই নাম উচ্চারণ করার ফলে তখনই বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া অজামিলের আত্মাকে যমদূতদের হাত হইতে মোচন করিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ খুবই তন্ময় হইয়া অজামিল-উপাখ্যান শুনিতেছিলেন। সর্বশেষে পাঠ হইল—

'ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।।'

অর্থাৎ হে রাজন্! শ্রদ্ধাহীন অজামিল মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াও ভগবদ্‌ধামে গিয়াছিলেন। আর যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের নামকীর্তন করেন, তাঁহারা যে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাপুরুষজী খুবই

অভিভূত হইয়া বলিলেন—আহা! দেখ, ভগবানের নামের কী অদ্ভুত শক্তি! বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার, কি সুন্দর কথা! তাই তো ঠাকুর বলতেন—'নাম-নামী অভেদ।' এ খুব পাকা কথা। ঐ নামের মধ্যেই তো সব; নাম ব্রহ্ম। তিনি নামের মধ্যে বাস করেন। যেখানে ভগবানের নামকীর্তন হয়, সেখানে ভগবান সর্বদা বিরাজ করেন।

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।'

—ভগবান নারদকে বলছেন, 'হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি না, কিন্তু যেখানে আমার ভক্তগণ আমার নাম গান করে, আমি সেখানে অবস্থান করি।' ঠাকুর খুব হরিনাম করতে বলতেন। তিনি বলতেন—'গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছের সব পাখি উড়ে পালায়, তেমনি হরিনাম করলেও দেহের সব পাপ চলে যায়।' ঠাকুর নিজেও হাততালি দিয়ে খুব নাম করতেন। যখন নাম করতে শুরু করতেন তখন ভাবস্থ হয়ে অবিরাম নাম করে যেতেন। তাঁর সবই ছিল অদ্ভুত।

সেদিন অজামিল-উপাখ্যান শুনিয়া মহাপুরুষজী এত খুশি হইয়াছিলেন যে, পরে যেই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছিল, তাহাকেই ঐ ভাগবতপাঠের কথা আনন্দ করিয়া বলিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠ

১৩ পৌষ, বুধবার, ১৩৩৯—২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২

সারাদিনই ভক্ত ও দর্শকের ভিড় সমভাবেই চলিয়াছে। ঢাকার জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার পরলোকগত পুত্রের বাক্সে মহাপুরুষ মহারাজের ফটো ও জপমালা দেখিতে পাইয়া বিকালবেলা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই মহাপুরুষজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি ছেলেটির মৃত্যুর সব ঘটনা বলিয়া ছেলের জন্য খুবই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী ধীরভাবে সব শুনিয়া পরে বলিলেন—আপনার ছেলে ভগবদ্‌ভক্ত ছিল; তার আত্মার নিশ্চয়ই সদগতি হয়েছে। সে মহা ভাগ্যবান; তার জন্য আপনি শোক করবেন না। সে জন্মেছিল খুবই শুভ সংস্কার নিয়ে, তাই অল্প বয়সেই ভগবানে মতিগতি হয়েছিল এবং তার জীবনের যা উদ্দেশ্য ছিল, তা সাধন করে স্বধামে চলে গেছে। তা ছাড়া 'জন্ম-মৃত্যু'—এতে মানুষের কোন হাত নেই, এ-সব ঈশ্বরেচ্ছাধীন। তিনিই জানেন কাকে কতদিন এ-সংসারে রাখবেন। সব দেহেরই নাশ আছে; এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও নেই। ছেলে গিয়েছে; আপনাকেও একদিন যেতে হবে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—যাদের আপনার জন মনে করছেন, সকলকেই যেতে হবে। কেউ চিরকাল থাকবে না। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং

শোচিতুমর্হসি।' যে ব্যক্তি জন্মেছে তার মৃত্যু ধ্রুব; তাই সেই অপরিহার্য বিষয়ের জন্য শোক করতে বারণ করছেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি বলুন তো? ভগবান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য—তা ছেলে, পরিবার ইত্যাদি থাক আর যাক। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। ছেলের খুব সুকৃতি ছিল; তার সদগতি হয়ে গেছে। এখন আপনার নিজের যাতে সদগতি হয় তাই করুন। আপনার স্ত্রীকেও তাই বলুন। শুধু বললে কি হবে—করতে হবে। খুব রোখ করে ভগবানলাভ যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। লেগে যান আজ থেকেই—পলে পলে জীবন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাকে যে কখন মরতে হবে, তা কেউ জানে না; অতএব একদিনও বৃথা যেতে দেবেন না। যারা ভাবে যে, ও-সব পরে করা যাবে, তাদের কখনো হয় না; তারা এ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের মধ্যে অনন্তকাল হাবুডুবু খাবে।

পরে খুবই ভাবের সহিত গাহিলেন—

'ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলো না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সে কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে।।'

সংসারে যাদের আপনার ভাবছেন, তারা কেউই আপনার নয়। একমাত্র আপনার জন হলেন শ্রীভগবান। তিনি জনম-মরণের সাথী, জীবের অন্তরাত্মা। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের।

বেলুড় মঠ

জনৈক সন্ন্যাসী কিছু দিন মঠবাস করিয়া শাখাকেন্দ্রে নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি সকালবেলা আসিয়া প্রণাম করিতেই মহাপুরুষ মহারাজ সস্নেহে বলিলেন—আজ তো য—চলল। এবার অনেক দিন মঠে ছিলে। ঠাকুরের স্থান। তা যাও। তোমরা ভক্ত লোক, যেখানে যাবে, ঠাকুরও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তাঁর ভক্তেরা যেখানে থাকে, তিনিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনি খুব ভক্তবিলাসী। 'মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ,'—যেখানে ভক্তেরা তাঁর নামগুণ কীর্তন করেন, তিনি সেইখানেই বাস করেন। এখন তো ঠাকুরের ভক্ত সর্বত্রই রয়েছে, আরো কত হবে। এই দেখ না, সবে মাত্র ৪৪।৪৫ বৎসর তিনি দেহ রেখেছেন, এরই মধ্যে কি কাণ্ড হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে তত তাঁর মহিমা লোকে বুঝছে, আর তাঁর ভক্তসংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। যুগাবতার

যখন আসেন তখন এমনই হয়ে থাকে। 'Truth will reveal itself' —সত্য স্বয়ং-প্রকাশ। সূর্যকে দেখিয়ে দিতে কি আর, বাবা, অন্য আলোকের দরকার হয়? তেমনি আমাদের ঠাকুরও। তিনি নিজেই প্রকাশিত হচ্ছেন। এ তো আর সাজানো ঠাকুর নয়? এ স্বয়ং ভগবান, জীবের দুঃখে কাতর হয়ে জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করে এসেছেন। এখানে সকলকেই মাথা নোয়াতে হবে। রামকৃষ্ণনাম এ যুগের মন্ত্র। যে এখানকার শরণ নেবে, তারই কল্যাণ হয়ে যাবে। আজকাল সব দেশেই যারা thoughtful minds (মনীষী), সকলেই ভেতরে ভেতরে ঠাকুরের ভাবে ভাবান্বিত হচ্ছে। এমন কি বিলাতেও অনেক লোক আছে যারা ঠাকুর-স্বামীজীর ওপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন। অবশ্য এরা এখনো ও-সব প্রকাশ করে বলতে একটু সঙ্কোচ বোধ কচ্ছে; কারণ ভারত হলো পরাধীন দেশ, আর ওদেরই অধীন। তাই Indian ideas (ভারতীয় ভাব) বা Indian personality (ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে) প্রকাশ্যভাবে নিতে একটু লজ্জা বোধ করে। তবে এ ভাব ক্রমে কেটে যাবে। ঠাকুর হচ্ছেন জগদগুরু। তাঁর ভাব সকলকেই নিতে হবে। তাঁকে প্রকাশ্যে মানুক আর নাই মানুক, তাতে কিছু আসে যায় না। এখন West-এর (পাশ্চাত্যের) অনেকে ঐ এক ধুয়ো ধরেছে যে, বেদান্ত তো আমাদের দেশেই ছিল, ও-তো আর foreign (বিদেশী) জিনিস নয়!

বেলুড় মঠ

মহাপুরুষগণের দয়া চন্দ্রালোকের মতো স্নিগ্ধ মাধুর্যে জগৎ প্লাবিত করে; তাহাতে পাত্রাপাত্রভেদ থাকে না, জাতিবর্ণের বিচার থাকে না—ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই তৃপ্তিবিধান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়নিহিত করুণাজাহ্নবী বহিয়া যায়।

একদিন সকালে মহাপুরুষ মহারাজ একটু বিশ্রামের পর নিজ খাটে বসিয়া আছেন—খুব গম্ভীর অন্তর্মুখ ভাব। হঠাৎ পার্শ্বস্থিত জনৈক সেবককে বলিলেন—হ্যাঁরে, দেখ তো দীক্ষাপ্রার্থী কেউ আছে কি? সেবক ঘরের বাহিরে আসিয়া এদিক সেদিক দেখিয়া পরে নিচে নামিয়া আসিলেন এবং তথায় একজন দীক্ষাপ্রার্থী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিলেন, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি যুবতী, পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং সঙ্গে একজন পুরুষ। সে নিজেই তাহার পঙ্কিল জীবনের পরিচয় দিয়া বলিল যে, যদিও তাহার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া সে বিপথগামিনী হইয়াছে এবং নীচজাতীয় একজন লোকের সহিত বাস করিতেছে, সেই লোকটিই সঙ্গে আসিয়াছে। পরে খুব করুণভাবে বলিল—আমি কি একবারটি তাঁর দর্শন পাব না? তিনি কি আমার মতো অধমকে কৃপা করবেন না?

সেবক খুব ভারাক্রান্ত মনে মহাপুরুষজীর কাছে ফিরিয়া আসিতেই তিনি খুব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে, কেউ আছে?

সেবক খুব কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—মহারাজ, একজন স্ত্রীলোক দীক্ষা নেবার জন্য এসেছে, কিন্তু তার জীবন যে কলুষিত—। মুখের কথা শেষ না হইতেই মহাপুরুষজী বলিয়া উঠিলেন—তাতে হয়েছে কি? তাকে গঙ্গাস্নান ও ঠাকুরদর্শন করে আসতে বল। আমাদের ঠাকুর পতিতপাবন। তিনি এসেছিলেন পতিতদের উদ্ধারের জন্যই। তিনি যদি এদের তুলে না নেন তো এদের উপায় কি? তা হলে তাঁর পতিতপাবন নাম কিসের?

মহাপুরুষজী যেন তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া জীবকে কৃপা করিবার জন্য উন্মুখ। অতঃপর স্ত্রীলোকটি স্নানাদি করিয়া দীক্ষার জন্য আসিলে মহাপুরুষজী যেন সবই জানিতে পারিয়া বলিলেন—ভয় কি, মা, তুমি যখন পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছ, তোমার পরম কল্যাণ হবে। বল—'ইহকালে পরকালে যত পাপ করেছি, সব এখানে দিলাম, আর পাপ করব না।'

যথাবিধি দীক্ষাদি হওয়ার পর স্ত্রীলোকটি যখন বাহিরে আসিল, তখন যেন সে এক নূতন লোক!

সেদিন মহাপুরুষ মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন—এ-সব শরীরে এত অসুখ, এত কষ্টভোগ কেন জানিস? এ-সবের পাপগুলো এ শরীরে ভোগ হয়ে যাচ্ছে। নইলে এ শরীরে এত ভোগ কিসের?